স্বর্গীয় নীরদচন্দ্র চৌধুরীর প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতে গিয়া প্রথমেই পাঠকবর্গের প্রতি আবেদন এই যে, আপনারা আমাকে ভুল বুঝিবেন না। নীরদবাবু আপনাকে আপনি ভুল বুঝিয়া মৃত্যুর বহু পূর্বেই আত্মঘাতী হইয়াছিলেন। ভুল বুঝিবার বড় জ্বালা। আমি নীরদবাবুর সেই জ্বালা জুড়াইতে চাহিয়াছিলাম। তাঁহার জীবদ্দশাতেই এই গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়া আপনার আত্মঘাতী রূপটি সম্পর্কে নীরদবাবুকে সচেতন করিতে চাহিয়াছিলাম, যাহাতে তাঁহার আপনাকে ভুল বুঝিবার আর অবকাশ না থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আমি এই গ্রন্থটি প্রকাশ করিবার পূর্বেই তিনি চলিয়া গেলেন। আমি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে এই গ্রন্থটি তাঁহার চরণে অর্পণ করিবার সুযোগ পাইলাম না। লেখক নীরদ চৌধুরীর অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিশাল প্রতিভার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আন্তরিক। তাঁহার আত্মঘাতী রূপটি আমাকে বিশেষ পীড়া দিয়াছে। তাই এ গ্রন্থের অবতারণা।

—ড. রাধা নাগ

The Statesman

MONDAY 9 APRIL 2001

## Taking on Nirad C.

RADHA Nag's recently-published *Atmaghati Nirad Chandra* is a welcome answer to Nirad C. Chaudhuri's *Atmaghati Bangali* and the two-volume *Atmaghati Rabindranath*. In more than a decade since the publication of the first volume of this trilogy on the dire self-destruction of the Bengali people and their greatest poet, no Bengali has raised his voice against this charge — perhaps because it was framed by a Bengali who penned them in a respectable university town in England, clad in a Bengali dhoti, sitting on a Bengali mat.

Nag's beautifully-produced 80-page volume bears ample proof of its author's commendable economy of expression. She has used NCC's Bengali works to show that obscenities abound in them. The writer who held an honorary D. Litt. from Oxford, it seems, could not make his points without outraging the proverbial British sense of decency.

Chaudhuri the author, shows Nag, had been so trapped by Chaudhuri the man that he often makes unseemly self-revelations. And it may not be improbable that he was deliberately ribald to cater to popular tastes.

Nag's book is written in a delightfully ironic style and if she's sometimes hard on Chaudhuri, she has been so for the sake of truth.
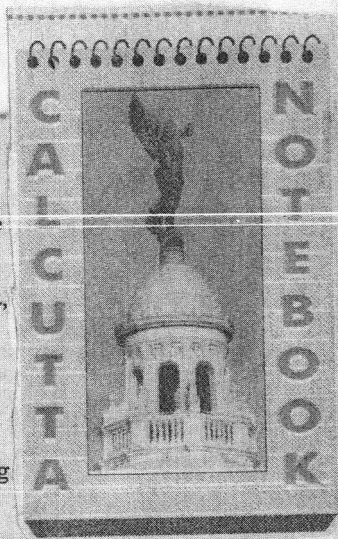
# আত্মঘাতী নীরদ চৌধুরী

## ড. রাধা নাগ

সাহিত্যশ্রী
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

ATMAGHATI
NIROD CHOWDHURY

Dr Radha Nag



প্রথম সংস্করণ ঃ
অগ্রহায়ণ ১৪০৬ ❑ নভেম্বর ১৯৯৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীতপনকুমার ঘোষ
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

বর্ণ সংস্থাপন ঃ
গ্রাফকো
প্লট নং-২৭০, মিলন নগর,
সল্টলেক, সেক্টর-ফোর,
কলিকাতা-৯১

মুদ্রাকর ঃ
কলার গ্রাফিক্স
৪ ক্রীক লেন
কলিকাতা - ১৪

প্রচ্ছদ ঃ
গৌতম দাশগুপ্ত

মূল্য ৩৫ টাকা মাত্র।

স্বর্গীয় নীরদ চৌধুরীকে
আমার এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করিলাম

# মুখবন্ধ

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর লেখক সত্তাটি যেন নীরদ। সেই নীরদ দিয়া তিনি সর্বদা তাঁহার চন্দ্রমুখকে আচ্ছাদিত রাখিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু চাঁদে কলঙ্ক থাকিলেও চাঁদের দিকে তাকাইয়া কেহ তাহার কলঙ্কের কথা চিন্তা করে না, জ্যোৎস্নাই দেখে। এই কথাটি মনে রাখিলে ব্যক্তি নীরদকে চাপা দিবার জন্য নীরদবাবু হয়তো এত ব্যস্ত হইতেন না। 'নীরদ' শব্দটির আরেকটি অর্থ হইল—নাই রদ যাহার ; অর্থাৎ যিনি দন্তহীন। অথচ নীরদচন্দ্র চৌধুরী সর্বদাই দংশন করিবার চেষ্টায় তৎপর থাকিয়াছেন এবং সেজন্য গর্বও অনুভব করিয়াছেন। এমনকি কেহ যদি তাঁহার সমালোচনা করেন, তাঁহাকেও নীরদবাবু দংশন করিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। হায়! দন্তহীন বৃদ্ধের এই আস্ফালন দেখিলে মায়াই হয়। ইহা অপেক্ষা তিনি যদি সাহিত্যের রস চুষিতে চাহিতেন, তাহা হইলে যথার্থ বুদ্ধি এবং রসজ্ঞতার পরিচয় দিতেন। কিন্তু এখানেও তাঁহার শৈশববস্থা কোনমতে ঘুচিলনা। শিশু যেমন নূতন দন্ত বিনির্গত হইবার সময় জুতা, জামা, কলম—যাহাই পায় একবার মাড়ি দিয়া কামড়াইয়া ধরে, তিনিও তাহাই করিয়া কাটাইলেন। কিছু শিশু আছে, যাহারা দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনার চক্ষু মুদিয়া মনে করে, বেশ হইয়াছে। আমাকে কেহ দেখিতে পাইতেছেনা। নীরদ চৌধুরী তাঁহার সাহিত্য-দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাই করিয়াছেন। আপনার চক্ষু মুদিয়া ভাবিয়াছেন যে, তাঁহার ব্যক্তি স্বরূপটি পাঠক দেখিতে পাইলনা। কিন্তু আসলে যাহা হইয়াছে তাহা হইল এই যে, স্বয়ং তিনি ব্যতীত আর সকলেই তাঁহাকে দেখিল এবং দেখিল দুইটি রূপে-(১) লেখক রূপে ও (২) ব্যক্তিরূপে। কিন্তু এ

লেখক কেবল যে চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া আপনার ক্ষুদ্র ব্যক্তি-স্বরূপটিকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন তাহাই নহে, উপরন্তু তাঁহার এই দুইটি সত্তা পরস্পরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং পরস্পরকে আঘাতই করিয়াছে। আর ইহার সর্বাপেক্ষা বড় ট্রাজেডি এই যে, তিনি না জানিয়াই আপনি আপনাকে আঘাত করিয়াছেন। ইংরাজীতে বলা হয়-'pen is mighter than the sword' এই কথারই প্রমাণ করিয়া নীরদবাবু তাঁহার লেখনীকে তরবারি অপেক্ষাও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তাহার দ্বারা আপনাকেই দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছেন। পাঠকবর্গের নিকট আমার অনুরোধ, আপনারা আমাকে ভুল বুঝিবেন না। নীরদবাবুর নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার স্বরূপটিকে আবিষ্কার করাই আমার উদ্দেশ্য। তাই তাঁহার এই দ্বিখণ্ডিত আত্মঘাতী রূপটিকেই আমি এই গ্রন্থে ধরিতে চাহিয়াছি।

**ড. রাধা নাগ**

## প্রথম অধ্যায়

# চোরের মায়ের বড় গলা

'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' গ্রন্থে নীরদচন্দ্র চৌধুরী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—'আমি নিজের দুর্বলতাকে অতিক্রম করিয়াছি, যাহাকে আমি বাঙালী জীবনের 'ক্ষুধিত পঙ্ক' বলি, তাহাও আমাকে গ্রাস করিতে পারে নাই।'[১] যেখানে সত্যের জোর থাকেনা, সেখানে গলার জোর অত্যন্ত জরুরি হইয়া পড়ে। তাই এই বৃদ্ধ বয়সেও নীরদ চৌধুরীকে বাধ্য হইয়াই উচ্চকণ্ঠ হইতে হইল। ইহার জন্য তাঁহাকে আমি দোষী করিব না। আপনার ত্রুটি গোপন করা এবং আপনাকে অন্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করা মানুষের ধর্ম। আপনার সম্পর্কে এমন অনেক অসত্য মনগড়া বিশ্বাস লইয়াই মানুষ বাঁচিয়া থাকে। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের কথা বলি। তিনি সারা জীবন অসৎ পথে প্রচুর উপার্জন করিয়াছেন। কিন্তু নিজের সম্পর্কে তিনি বলিতেন—'আমি অসৎ এই কথা আমি গোপন রাখিনা। তাই আমি সৎ।' গান্ধী-ঘাতক নাথুরাম গড়সেও তাঁহার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হইয়া গর্বিতই হইয়াছেন। নীরদ চৌধুরী সম্পর্কে আমার অভিযোগ অন্য। তাহা হইল এই যে, লেখক নীরদ চৌধুরী যাহা মনে বিশ্বাস করিয়াছেন, এখানে তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তি নীরদ চৌধুরী জানেন যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্বাংশে সত্য নহে। লেখক নীরদ চৌধুরী এখানে ব্যক্তি নীরদ চৌধুরীর কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

আসুন, ব্যাপারটা একটু খোল্‌সা করিয়া বলা যাক। 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'অক্ষমের ক্ষমতা' শীর্ষক অংশে 'পরের মত' বলিয়া তিনি আপনার যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,

তাহা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি নীরদ চৌধুরীরই মত; যাঁহাকে লেখক নীরদ চৌধুরী চিরকাল পর মনে করিয়াছেন এবং পর করিয়াও রাখিয়াছেন। উল্লিখিত অধ্যায়ে নীরদবাবু আপনার কর্মবিমুখতা, বাচালতা, নষ্টামি, জ্যাঠামো প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন। আলোচনা করিলে দেখা যাইবে এগুলির মধ্যে কোনটিই তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। অল্প বয়সে যেমন তিনি ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইয়াছেন, এই বৃদ্ধ বয়সেও তাহাই করিতেছেন। যুবা বয়সে নীরদচন্দ্র চাকুরি পাইয়াও ফাঁকি দিয়াছেন এবং অবশেষে চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া ভ্রাতাদের গলগ্রহ হইয়াছেন। আর এই পরিপক্ক বয়সেও তিনি বলিতে লজ্জাবোধ করেন নাই 'বিলাত বাসের তৃতীয় লাভ ঃ জীবিকার্জনের ভাবনা হইতে মুক্তি।'[২] নীরদবাবু জাঁক করিয়া বলিয়াছেন বটে 'আমি অবশ্য দেহের আকারে রবীন্দ্রনাথের কাছে pigmy, তবে বুদ্ধিতে এত বিভিন্ন তাহা স্বীকার করিব না।'[৩] কিন্তু মুক্তির আদর্শে যে তাঁহারা কত ভিন্ন তাহা আশা করি স্বীকার করিবেন। এমনকি এই 'মুক্তি' লাভ করিবার জন্য ইংরাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেও নীরদবাবু দ্বিধা করেন নাই। বলিয়াছেন—'আমি বিলাতের শাসন ব্যবস্থার জন্য অন্ন-সংস্থানের দায় হইতে মুক্ত হইয়াছি। ইহার জন্য আমি ইংরেজ জাতির কাছে কৃতজ্ঞ।'[৪]

বাচালতাই বলুন বা নষ্টামিই বলুন বা দুষ্টামিই বলুন-তাহার কোনটাই নীরদবাবু কাটাইয়া তো ওঠেনই নাই, বরং তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াছে। বৃদ্ধ বয়সের দ্বিতীয় শৈশবে পৌঁছাইয়া উহা চরম আকার ধারণ করিয়াছে বলিলেও চলে। ১৯৬৯ সনের উল্লেখ করিয়া তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন- 'সেই সময়ে একটি মহিলা আমার বয়সের অনুচিত চাপল্য দেখিয়া লিখিয়াছিলেন, 'আপনার বয়স যত বাড়ছে, নষ্টামি দুষ্টামিও ততই বাড়ছে।' এখন সাতানব্বুই চলিয়াছে, কম হওয়া দূরে থাকুক, সেই চাপল্য আরও বাড়িয়াছে।'[৫] যে সকল শিশুর প্রতি কেহ বিশেষ মনযোগ দেয়না, তাহারা দুষ্টামির দ্বারাই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহে। চৌধুরীরও তাহাই হইয়াছে। তাঁহার ক্ষুদ্রকায় চেহারাটি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উপযোগী নহে। তাই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য তাঁহাকে দুষ্টামির আশ্রয় লইতে হইয়াছে। এমনকি লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাইবার নিমিত্তও তিনি তাঁহার এই দুষ্টবুদ্ধিকে কাজে লাগাইয়াছেন। যে কথা বলিলে বাঙালী ক্ষেপিবে,

সেকথা বাঙালীকে বলিয়াছেন। যেকথা বলিলে ইংরাজ রুষ্ট হইবে তাহাও ইংরাজকে বলিয়াছেন। ইহা তাঁহার সাহসের পরিচয় নহে, নষ্টামি। সিদ্ধরসের ব্যত্যয় ঘটাইয়া উদ্ভট নূতন কিছু বলিয়া সস্তা বাহাদুরি কুড়াইবার ইচ্ছা। তাই তাঁহার সাহিত্য-দর্পণের কাচটিকে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে অসমতল রাখিয়াছেন। ফলে তাহাতে যাহারই ছায়া পড়ে, তাহাই বিসদৃশ আকারের হইয়া মুখ ভ্যাংচায়। মেলার তাঁবুতে এই তামাসা দেখিবার জন্য যেমন ভীড় হয়, তাঁহার লেখা পড়িবার জন্য তাই তেমনই হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। ভাবিতে কষ্ট হয় সস্তা হাততালির লোভে নীরদবাবু তাঁহার প্রতিভাকে তামাসায় পরিণত করিলেন। নতুবা তাঁহার প্রজ্ঞা, ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা তাঁহাকে কোথায় না পৌঁছাইতে পারিত ! এইরূপে নীরদবাবুও রাতারাতি জনপ্রিয় হইবার লোভে 'বাঙালীর ক্ষুধিত পঙ্কে' পা দিলেন। পাঁক ঘাঁটাঘাঁটিই তাঁহার সার হইল। পঙ্কজ হইয়া ফুটিতে পারিলেননা।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে নীরদ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাঙালীর ক্ষুধিত পঙ্কে' ডুবিবার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের পক্ষেও কিছু কম সত্য নহে। বস্তুত, তাঁহার অবচেতন মনের ব্যক্তি আমি যেন রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনামে আপনার লেখক-সত্তারই সমালোচনা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নীরদবাবু বলিয়াছেন-'স্ব-জাতির আচরণ সম্বন্ধে তিনি যৌবন হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত যে-সব উক্তি করিয়াছেন তাহা যেন পাগল মেহের আলির 'তফাৎ যাও, তফাৎ যাও' চীৎকারের মত।'[৬] পাগলের ন্যায় এহেন চীৎকার নীরদবাবুও কিছু কম করেন নাই। প্রভেদ কেবল এই যে, রবীন্দ্রনাথের 'তফাৎ যাও' তাঁহার মুখে 'তফাৎ রও' হইয়া গিয়াছে। স্বজাতির ছোঁয়াচ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি অহঙ্কারের বর্ম পরিয়াছেন। তিনি স্বয়ং কহিয়াছেন- 'নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হওয়ার ফলে আমি সাধারণ বুদ্ধির লোকের সঙ্গে মিশিতে পারিতাম না।'[৭] অথচ ঠিক রবীন্দ্রনাথের মতোই এই সাধারণ বুদ্ধির স্বজাতির সমাদরের প্রত্যাশী হইয়া রহিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নীরদবাবু বলিয়াছেন-'তিনি সারা জীবনই বাঙালীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রত্যাশী হইয়া রহিলেন। উহা না পাইয়া পরবর্তীকালে যখন তিনি পাশ্চাত্ত্য জগতের সমাদর হইতে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিলেন, তখনও বাঙালীর প্রীতি পাইবার বাসনা ছাড়িতে পারেন নাই।'[৮] নীরদ চন্দ্র চৌধুরী সম্বন্ধে

এ কথাগুলি অধিকতর প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। তাই ১৯৫৯ তে 'অটোবায়োগ্র্যাফি অব্ এন্ আন্‌নোন্ ইণ্ডিয়ান' লিখিয়া বিদেশে প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াও তাঁহার মন ভরে নাই। ১৯৬৮ সালে বাংলায় লিখিয়াছেন 'বাঙালী জীবনে রমণী।' ১৯৮৮ সালে পুনরায় বাংলায় 'আত্মঘাতী বাঙালী' লিখিয়াছেন এবং ১৯৮৯ সালে অক্সফোর্ডে সাম্মানিক ডি. লিট পাইয়াও তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। ১৯৯২ সালে 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ' লিখিয়াছেন। যথাক্রমে 'আত্মঘাতী বাঙালী'র তিনটি খণ্ড ও 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথে'র দুইটি খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৯৬ সালে 'ডাফ কুপার' পুরস্কার পাইয়া পর্যন্ত তিনি থামিতে পারিলেন না। ১৯৯৪ সালে বাঙালীদের জন্য লিখিতে বসিলেন 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি।'

বাঙালীর কাছে সমাদর পাইয়া যে নীরদবাবু পরপর বাংলায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এমত তো নহে। বাঙালীর কাছে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাইবার আকাঙ্ক্ষাতেই তিনি এইভাবে এই বৃদ্ধ বয়সেও বাংলা গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হইয়াছেন। দেশবাসীর নিন্দা তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' গ্রন্থটি বাংলায় লেখার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন 'ইংরেজীতে লিখিয়া দেশে আমাকে ভুল বুঝিবার অবকাশ দিয়াছি। সেই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্যই ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ জীবন কাহিনীর কিছু কিছু বাংলায় দিতেছি।'[৯] দেশবাসী তথা বাঙালীর নিন্দায় যখন নাকি নীরদবাবুর কিছুই আসে যায় না, তখন দেশবাসী যাহাতে তাঁহাকে ভুল না বোঝেন তাহার জন্য এত সযত্ন প্রয়াস কেন? আমি ইহা লইয়া অনেক চিন্তা-ভাবনা করিয়া যাহা দেখিয়াছি তাহা হইল এই যে, স্বদেশ ও বাঙালী যেন নীরদবাবুর বিবাহিতা স্ত্রী। আর ভারতে নারীদের পতি নিন্দার কথা কেনা জানে? ভারতচন্দ্র তো এ ব্যাপারে সবিশেষ তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেই কহিয়াছেন। তা নীরদবাবুর এই দাম্পত্য কলহ মন্দ হয় নাই। রাগ দেখাইয়া নীরদবাবু পর রমণীর গৃহে (বিদেশে) পর্যন্ত মান করিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু আপনার স্ত্রীর ভালবাসা পাইবার আকাঙ্ক্ষা যেমন যায় নাই, স্ত্রীর ভালবাসা না পাইবার ক্ষোভটুকুও রহিয়া গিয়াছে। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পটির কথা মনে পড়ে। সেখানে স্ত্রীর ঔদাসীন্যে ব্যথিত অপূর্ব বিদায়কালে স্ত্রীর চুম্বন চাহিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছিল। অভিমান ভরে স্ত্রীকে ছাড়িয়া কলকাতায়

গমন করিয়াছিল। অবশেষে অবশ্য তাহাদের স্বামী-স্ত্রীর 'অনেকদিনের একটি হাস্য বাধায় অসম্পূর্ণ চেষ্টা 'অশ্রু জলধারায় সমাপ্ত হইল।'[১০] কিন্তু এমন 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' শ্রী নীরদ চৌধুরীর ভাগ্যে ঘটিবে কিনা সন্দেহ আছে। সাহিত্যের পুরস্কার প্রীতি চুম্বন প্রত্যাশা করিয়া বাঙালীর নিকট নীরদবাবুও কম হাস্যাস্পদ হন নাই, উপরন্তু নিন্দার ভাগী হইয়াছেন। তাই রাগে, অভিমানে বিদেশে যাইয়াও তাঁহার এ ক্ষোভ দূর হয় নাই। বলিয়াছেন—'নিন্দুকেরাও আমার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার কথা জানেন, আমার লেখার গুণ অস্বীকার করিলেও, কেবল তাঁহারা উহা জানিতে চাহেন না।'[১১] এমনকি সুন্দরী ইতালিয়ান মেমসাহেবের চুম্বন পাইয়াও তিনি সুখী হন নাই। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছেন—'আমার ইংরেজি রচনা পড়িবার পর আমাকে চুম্বন করিবার ইচ্ছা কি কোনও বাঙালী বা তরুণ যুবতীর হইবে?'[১২] বেচারা! নীরদবাবু যশ, প্রতিষ্ঠা, অর্থ সকলই পাইলেন, আপনার স্ত্রীর ভালবাসাই পাইলেন না। আপনাকে ভুলাইতে বিদেশের সুখ-সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্যের নিকট আত্ম বিক্রয় করিলেন। 'বাঙালীর ক্ষুধিত পঙ্ক' তাঁহাকে গ্রাস করিল। ইহার পরও যদি পরশুরামের 'জাবালি' গল্পে জাবালি পত্নীর মতো নীরদবাবুর গিন্নি সম্মার্জনী হস্তে ছুটিয়া না আসেন, তবে রসভঙ্গ হয় বৈকি! না, রসভঙ্গ হয় নাই। রসময়ী ছুটিয়া আসিয়া সম্মার্জনী হস্তে বেশ করিয়া দু'কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। চির সতীনের ন্যায় শত্রু ইংরাজকে প্রথমে কহিয়াছেন—'হলা দগ্ধাননে নির্লজ্জে ঘেঁচী, তোর আস্পর্ধা কম নয় যে আমার স্বামীকে বোকা পাইয়া ভুলাইতে আসিয়াছিস![১৩] তাহার পর গৃহিণী বুড়া স্বামীকেও যথোচিত সম্ভাষণ করিতে ভোলেন নাই। নথ নাড়িয়া কহিয়াছেন—'আর ভো অজ্জউত্ত, তোমারই বা কি প্রকার আক্কেল যে এই উৎকপালী, বিড়ালাক্ষ্মী, মায়াবিনীর সহিত বিজনে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলে।'[১৪] জাবালী স্নেহময়ী পত্নীর প্রেমালাপ বুঝিতে ভুল করেন নাই। তিনি ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ ছিলেন। তাই অপ্সরাও তাঁহাকে ভুলাইতে পারে নাই। কিন্তু নীরদবাবু বাঙালী স্ত্রীর প্রণয় সম্ভাষণকে গালি ভাবিয়া ভুল করিলেন। উপরন্তু ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারিলেন না। মায়াবিনীর মোহ কাটাইবার শক্তি তাঁহার হইল না। আপনার এই শক্তি -হীনতার কথা ব্যক্তি নীরদচন্দ্র ভালই বুঝিলেন, কিন্তু লেখক নীরদের ভ্রূকুটি দেখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল

ছেলেবেলায় আমার একটি খেলার সাথী ছিল। তাহার নাম ছিল হারাধন। সকল বিষয়েই সর্দারি করা তাহার স্বভাব ছিল। অথচ তাহাকে কেহই পুঁছিতনা। হয়তো আমরা রবারের বল দিয়া ক্রিকেট খেলিতেছি। সে আসিয়া বলিত 'ঐ বলে খেলিসনা রে। ঐ বলে একদম স্পিন হয়না। প্লাস্টিকের বলে খেলবি। দেখবি কেমন বল ঘোরে।' বলা বাহুল্য, ক্রিকেটের বিষয়ে তাহার কিছুই জ্ঞান ছিলনা। তবু বলা চাই। তাহার মোড়লি দেখিয়া আমরা চটিয়া যাইতাম। কহিতাম—'তার চেয়ে তোকেই বল বানিয়ে খেলি। আরও ভাল স্পিন হবে।' তাহাতেও সে দমিত না। পরদিন হয়তো আমরা এক্কা-দোক্কা খেলিতেছি, সে ঘাড় বাড়াইয়া বলিত—'উঁহু, ঘরের দাগগুলো ঠিক কাটিসনি। মোছ, আমি দাগ কেটে দিচ্ছি।' আমরা অবশ্য তাহার কথায় কর্ণপাত করিতাম না। কিন্তু তাহাতে তাহার উৎসাহে ভাঁটা পড়িত না। ফলে এই হইয়াছিল যে, দূর হইতে হারাধনকে আসিতে দেখিলেই আমরা কহিতাম—'ঐরে! হারু আসছে।' সম্প্রতি নীরদবাবুর এইরূপ গায়ে পড়িয়া মোড়লি করিবার প্রবণতা দেখিয়া ভয় হয় যে, তাঁহার গ্রন্থের পাঠকবর্গও হয়তো আমাদের ন্যায় সমস্বরে বলিয়া উঠিবেন—'ঐরে! নীরু আসছে।'

আমরা জানি, ব্যক্তি নীরদ চৌধুরী নেহাৎই নিরীহ, গোবেচারা মানুষ। মোড়লি করা দূরে থাক, তাঁহার মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এমনকি স্ত্রী-পুত্র অবধি কেহই তাঁহাকে পাত্তা পর্যন্ত দেন নাই। নীরদবাবু নিজেই 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' গ্রন্থে কহিয়াছেন—'আমি পড়াশোনায় খুব ভাল তাহাও কেহ মনে করিত না। এ বিষয়ে আমি আমার দাদার ছায়ায় পড়িয়া গিয়াছিলাম। তাঁহার 'ভাল ছাত্র' বলিয়া নাম ছিল, আমাকে সকলেই তাঁহার উপগ্রহ বলিয়া মনে করিত, এমনকি চেহারাতেও।'[১৫] অকর্মণ্য হইয়া অন্ন ধ্বংস করিবার জন্য ভাইরা পর্যন্ত নীরদচন্দ্রকে দু'কথা

শুনাইয়াছেন। এ প্রসঙ্গে 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' গ্রন্থের অন্তর্গত 'অক্ষমের ক্ষমতা' শীর্ষক প্রবন্ধে নীরদ চৌধুরী কহিয়াছেন—'ছোট ভাই-এর মুখ হইতে এরকম অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া আমি তাহাকে এক চড় মারিলাম।'[১৬] তাহাতে অবশ্য নীরদবাবুর ভাই তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন নাই, প্রহার করিতে আসিয়াছিলেন। কেবল ভাইরাই নহে, আত্মীয়-স্বজন—কেহই তাঁহাকে অপমান করিতে ছাড়ে নাই। ক্ষুব্ধ হইয়া নীরদবাবু কহিয়াছেন-'এইটুকু শুধু বলিব, আমাকে এত অপমান না করিলেও তাঁহারা পারিতেন।'[১৭] এইরূপ অপমানিত না হইলেও, সংসারী মানুষ ব্যক্তি নীরদ চৌধুরীকে আমরা সংসারের কর্তার ভূমিকায় দেখিনা। নীরদবাবুর পত্নীই তাঁহার সংসারের হাল ধরিয়াছেন। তাঁহার ছেলেপুলেরাও শিক্ষার ব্যাপারে পিতা অপেক্ষা মাতার উপরেই অধিক নির্ভর করিয়াছে। পুত্রদের কলেজে ভর্তি করা, উচ্চশিক্ষার্থে মধ্যম পুত্রকে বিলাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা—সবই অমিয়া চৌধুরানী করিয়াছিলেন। সুতরাং ঘরে বাইরে কোথাও ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি নীরদ চৌধুরী মোড়লি করিবার সুযোগ পান নাই। উপরন্তু তাঁহাকে হলাহলের ন্যায় অপমান পান করিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি নীলকণ্ঠ নন। তাই কণ্ঠে বিষ ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই, কলমের মুখে ওগড়াইয়া দিয়াছেন। আর ব্যক্তি নীরদের ক্ষোভ মিটাইতে লেখক নীরদ মোড়লি করিতে নামিয়াছেন। তাহার ফলে লেখক নীরদচন্দ্রের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-সমৃদ্ধ উচ্চস্তরের রচনার ভিতর ব্যক্তি নীরদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। 'আমি আমি' করিয়া আপনার প্রচারে নামিয়া তিনি তাঁহার গবেষণার মূল বিষয় হইতে সরিয়া গিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, নিজে কখনো যাহা করেন নাই, সেই ব্যাপারে সারগর্ভ উপদেশ দিতে পিছ-পা হন নাই। উপরন্তু আপনার জীবনকে বাঙালীর সম্মুখে দৃষ্টান্তস্বরূপ স্থাপন করিবার দুঃসাহস দেখাইয়াছেন। কহিয়াছেন-'আমি মনে করি বাঙালীর পক্ষে আমার জীবন দৃষ্টান্তস্বরূপ হইতে পারে।'[১৮] নীরদচন্দ্র চৌধুরীর এই ভূমিকা যেন ঐতিহাসিক যাত্রায় বিবেকের ভূমিকা। এক-দুইটা দৃশ্যে বিবেকের আবির্ভাব ও গান মন্দ লাগে না; বেশ ভাব ও রস জমাইয়া দেয়। কিন্তু ঐতিহাসিক যাত্রায় যদি বিবেকের আবির্ভাব অতি ঘন-ঘন হইতে থাকে এবং বিবেকই ঐ যাত্রার মূল চরিত্র হইয়া উঠে, তাহার উপর আবার ঐ যাত্রার মূল চরিত্রগুলিকে উপদেশ দান করিতে থাকে, তাহা কি হাস্যকর হয় না ? নীরদবাবু বিবেকের ক্ষুদ্র ভূমিকার সীমারেখার কথা ভুলিয়া গিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম খুঁজিয়াছেন। আত্মপরায়ণ এবং জ্ঞানপাপী লেখক নীরদ চৌধুরী তাঁহার লেখার দ্বারা বাঙালীর কত উপকার বা উন্নতি হইবে, তাহা না ভাবিয়া মনে করিয়াছেন-'বাঙালীর ইতিহাস থাকিবে; বাঙালী আবার যদি উন্নত নাও হয়, তাহা

হইলেও তাহার সৃষ্ট যে কীর্তি তাহার ঐতিহাসিক সার্থকতা থাকিবে। সেই ইতিহাসে আমার নাম থাকিবে—এই ভরসা আমি রাখি।"[১৯]

'আত্মঘাতী বাঙালী' হইতে উদ্ধৃত নীরদবাবুর উপরোক্ত মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করিলে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে-'......আমরা লোকহিঁতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোকসাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড় এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করিনা।'[২০] লেখক নীরদও দুই পক্ষেরই অহিত করিয়াছেন। বাঙালীর আত্মসম্মানে যেমন ঘা দিয়াছেন, উপযাচক হইয়া আসিয়া আপনার আত্মসম্মানও খোয়াইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন-'আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড়ো সে ছোটোর অপকার অতি সহজে করিতে পারে, কিন্তু ছোটোর উপকার করিতে হইলে কেবল বড়ো হইলে চলিবে না, ছোটো হইতে হইবে, ছোটোর সমান হইতে হইবে।'[২১] সুতরাং মানিয়া লইতে হয় যে, বাঙালীর উপকার করিবার অধিকার নীরদবাবুর নাই। বাঙালী অপেক্ষা আপনার শ্রেষ্ঠত্বের কথা তিনি বারম্বার সদম্ভে প্রচার করিয়াছেন। একটি মাত্র তাঁহার এতদ্বিষয়ক উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি- "বিবেকানন্দ এক শ্রেণীর ভারতীয়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, তাহারা 'বহু শতাব্দী যাবৎ স্ব-জাতি বিজাতি স্বধর্মী বিধর্ম্মীর পদভরে নিপীড়িত প্রাণ, দাসসুলভ পরিশ্রম অসহিষ্ণু, দাসবৎ উদ্যমহীন.... দাসোচিত ঈর্ষ্যা-পরায়ণ, স্বজনোন্নতি অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাস-হীন, শৃগালবৎ নীচ-চাতুরি প্রতারণা-সহায় স্বার্থপরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্বলের যমস্বরূপ, বলহীন, আশাহীন....' আমি এই জাতীয় ভারতীয় বা বাঙালী নই।"[২২] তাহা হইলে তিনি কি জাতীয় বাঙালী? সম্ভবত 'ঠ্যাটা' জাতীয়। 'ঠ্যাটা' কি রকম ? -ব্যাপারটি বুঝিতে হইলে উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির গল্প'টি পড়িতে হইবে। সে গল্পে রাজার একটি টাকা লইয়া পলাইয়া গিয়া টুনটুনি জাঁক করিয়া কহিয়াছিল—

'রাজার ঘরে যে ধন আছে
টুনির ঘরেও সে ধন আছে।'[২৩]

তাহাতে রাজার লোক গিয়া টুনটুনির বাসা হইতে রাজার টাকাটি লইয়া আসাতে টুনটুনি বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল—

'রাজা বড় ধনে কাতর
টুনির ধন নিলে বাড়ির ভিতর।'[২৪]

তাহা শুনিয়া রাজা কহিয়াছিলেন 'পাখিটা তো বড় ঠ্যাঁটারে!'[২৫] সেইরূপ নীরদচন্দ্র জাঁক দেখাইয়া কহিয়াছেন 'দেশের প্রায় সকল বাঙালী অপেক্ষা আমি খাঁটি বাঙালী আছি।'[২৬] ছড়ার ছন্দে বলা চলে—

'খাঁটি বাঙালীর যে গুণ আছে
আমার ভিতর সে গুণ আছে।'

তাহাতে বাঙালীর দোষের তালিকা নীরদবাবুর সম্মুখে পেশ করা হইলে তিনি বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন-

'বাঙালী বড় দোষে কাতর
ও দোষ নাই আমার ভিতর।'

নীরদবাবুর ভাষায়-'আমি এই জাতীয় ভারতীয় বা বাঙালী নই।' শুনিয়া রাজার মতো আর সব বাঙালী কহিল—

'চৌধুরী তো বড় ঠ্যাঁটারে।'

ঠ্যাঁটা টুনটুনি পাখিটি অবিশ্যি শেষ অবধি রাজার নাক কাটাইয়া ছাড়িয়াছিল। নীরদবাবুও যে বাঙালীর নাক কাটিবার তালে নাই, তাহা কে বলিতে পারে ?

আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া অধ্যায়টি শেষ করিতে ইচ্ছা করি। কলিকাতা হইতে সুদূর মফস্বলের রিক্সাওয়ালাদের দেখিয়াছি, রাত হইলে তাহারা মদ্যপান করিয়া আপনাদের রাজা-উজীর মনে করিয়া নানারূপ আস্ফালন করে। আপনার সন্তানকে বলে-'সকালে রিস্কা টানছিলি। এখন রাজা হয়ে গেলি। দ্যাখ্ বাপ, হামার পারা হতে পাইরবি ?' নীরদচন্দ্রের ন্যায় তাহারা আপনার জীবনকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের ন্যায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট খাড়া করে। আবার বস্তিতে কোনরকম গণ্ডগোল দেখিলেও মোড়লি করিতে ছুটিয়া যায়। বলে-'ছি! ছি! অমন কইরতে নাই। হামাকে দ্যাখ্। হামি কি তুয়াদের পারা ঝগড়া-ঝগড়ি কইরছি ?' তখন উহার মোড়লি দেখিয়া বস্তিবাসীরা হাসিয়া মুখ চাপা দেয়। বলে-'দমে মদ টাইনেছে আজ।'

লেখকরূপে আপনার যশ-মদিরা পান করিয়া নীরদবাবুও সেই দশা প্রাপ্ত হইলেন। কেবল তাঁহার গ্রন্থের পাঠক-বর্গই কি ? কে বলিতে পারে লেখক নীরদচন্দ্রের মোড়ালি দেখিয়া ব্যক্তি নীরদচন্দ্রও ঐরূপ হাসিয়া মুখ চাপা দেন নাই ?

## তৃতীয় অধ্যায়

# ‘ঠাকুর ঘরে কে?’ ‘আমি তো কলা খাইনি’

পাঠকবর্গ কৈফিয়ত চাহিতে না চাহিতেই লেখক নীরদ চৌধুরী তাঁহার কৈফিয়তের ঝুলি খুলিয়া বসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পে রহমতের ঝোলা দেখিয়া যেমন মিনির মনে ভয় হইয়াছিল যে উহাতে পেস্তা, কিশমিশ যতই থাক; দু’চারিটি জলজ্যান্ত বাচ্চা থাকা অসম্ভব নহে। তেমনি লেখক নীরদচন্দ্রের এই কৈফিয়তের ঝুলিটি দেখিয়া আমার ভয় হয়, উহাতে সুপটু বাক্য-বিন্যাস, আস্ফালনসহ যুক্তি যতই থাকুক, দু’চারিটা জলজ্যান্ত মিথ্যা থাকা অসম্ভব নহে। মিনির আশঙ্কা অবশ্য সত্য হয় নাই, আমারটি হইয়াছে। নীরদবাবুর কৈফিয়ত দিবার ধরণ দেখিয়া মনে হয়, এ যেন সেই ‘ঠাকুর ঘরে কে ?’ প্রশ্ন করিতেই সাত তাড়াতাড়ি মুখের কলা গিলিতে গিয়া বিষম খাইয়া হাঁকপাক করিয়া ভালমানুষের মতো বলিয়া ওঠা ‘আমি তো কলা খাইনি।’ নীরদবাবুর কৈফিয়তের দীর্ঘ তালিকা দেখিয়া মনে হয় তিনি যেন এক ফরিয়াদী আসামী। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া অদৃশ্য উকিলের জেরায় জেরবার হইয়া কাঁচুমাখু মুখে কৈফিয়ৎ দিতেছেন। কিন্তু ঐ অদৃশ্য উকিলটি কে ? তিনি নিজেই। এ জবাবদিহি ব্যক্তি নীরদ চৌধুরীর জবাবদিহি। ব্যাপারটি প্রকৃষ্টরূপে অনুধাবন করিতে হইলে পাঠকবর্গকে বঙ্কিমচন্দ্রের শরণ লইতে বলি। বঙ্কিমবাবু তাঁহার ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’-এর অষ্টম পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন-‘তুমি দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতামত ক্ষণকাল পরিত্যাগ করিয়া আমার কাছে একটা মোটা কথা শুন। সুমতি নামে দেবকন্যা এবং কুমতি নামে রাক্ষসী, এই দুইজন সর্বদা মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে বিচরণ করে; এবং সর্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে। ......আজি এই বিজন শয়নাগারে রোহিণীকে লইয়া সেই দুইজন সেইরূপ ঘোর বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল।’ এবং পরিশেষে

'....সুমতি চুপ করিল—তাহার পরাজয় হইল।'[২৭] বলা বাহুল্য এই ক্ষেত্রেও কুমতিরূপ লেখক নীরদবাবুর নিকট সুমতিরূপ ব্যক্তি নীরদবাবু পরাজিত হইলেন। কিন্তু দ্বন্দ্ব করিতে ছাড়িলেন না। তাই লেখক নীরদচন্দ্রের কৈফিয়ত দাখিল করিতে হইল আপনাকে আপনারই নিকট। বঙ্কিমবাবুর রোহিণী এই দ্বন্দ্বের শেষে কাঁদিয়াছিল। নীরদবাবুও কাঁদিবেন কি ? আপনার চক্ষে আপনার ভাল থাকা জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় প্রাপ্তি। সকল মানুষই তাই আপনাকে শ্রদ্ধা করিতে চান। কিন্তু আপনার নিকট আপনার ছলনা ধরা পড়িতেও সময় লাগে না। তখনই আসে কান্নার পালা। কান্নার পালা সাঙ্গ হইলে গলাবাজি করিয়া আপনার ফাঁকিবাজিকে চাপা দিবার হাস্যকর ও মর্মান্তিক প্রয়াস বাড়িয়া চলে। তাই বিদেশ বাসের কৈফিয়ৎ নীরদবাবুকে বেশ উচ্চকণ্ঠেই দিতে হইয়াছে। হৃদয়ের এই যে বৃত্তি, আপনার কৃতকর্মকে উদ্ভট যুক্তি দিয়া সমর্থন করিবার যে প্রবণতা, তাহাকে ফ্রয়েড আখ্যা দিয়াছেন-'rationalization'. দেখা যাক্ নীরদবাবু তাহা কিরূপে করিয়াছেন।

'আত্মঘাতী বাঙালী' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লেখক নীরদচন্দ্র বলিয়াছেন—'বিলাতে বাস করিয়া আমি যেভাবে কাজ করিতে পারিতেছি দেশে থাকিলে কখনই তাহা সম্ভব হইত না।'[২৮] ইহাকে আপনার চক্ষু ঠারা ছাড়া আর কি বলিব ? এই দেশে থাকিয়াই রবীন্দ্রনাথ 'রবীন্দ্রনাথ' হইয়াছেন, বিবেকানন্দ 'বিবেকানন্দ' হইয়াছেন, এবং সত্যজিৎ রায় 'সত্যজিৎ রায়' হইয়াছেন। তালিকা আরো দীর্ঘ করা যাইত, করিলাম না। লেখক নীরদ চৌধুরী অবশ্য সত্যজিৎ রায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'তিনি বাংলা ভাষায় বাঙালী জীবন লইয়াই ফিল্‌ম তৈরি করিয়াছেন। তাঁহাকে অনিচ্ছায় হইলেও কলিকাতায় থাকিতে হইত, নইলে তিনি 'অস্কার' পাওয়া দূরে থাকুক, ফিল্‌ম্-ও তৈরি করিতে পারিতেন না।'[২৯] ইহা অপেক্ষা অসত্য ভাষণ আর কি হইতে পারে ? প্রসঙ্গত আমার এক বান্ধবীর কথা বলি। সে তথাকথিত 'ভালো' স্কুলে পড়িত বলিয়া নাক-উঁচু করিয়া চলিত। কেহ যদি মফঃস্বলের সাধারণ স্কুলে পড়িয়া অসাধারণ রেজাল্ট করিত, তখন ঠোঁট উল্টাইয়া কহিত-'বাজে স্কুলে বেশি বেশি নম্বর দেয়। তাছাড়া বাড়িতে মা-বাবা পড়া দেখিয়ে দেয়। আমাদের মতো ভাল স্কুলে বোর্ডিং-এ থেকে পড়তে হলে ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া দূরের কথা, পাশও করতে হত না।' ইহাকে তাহার ঈর্ষ্যা না অজ্ঞতা বলিব ? নীরদবাবুর

ক্ষেত্রেও এই প্রশ্ন উঠে। হয় তিনি ঈর্ষ্যাকাতর নতুবা ফিল্ম সম্পর্কে অজ্ঞতাই তাঁহার এই উক্তির জন্য দায়ী। প্রথমতঃ, প্রতিভা দেশ কাল সবকিছুর উপরে আপনাকে বিকশিত করে। আগুনকে ছাই চাপা দিয়া রাখা যায় না। দ্বিতীয়ত, বাঙালীর অভাব বিদেশে নাই। সত্যজিৎবাবু তথা হইতে শিল্পী সংগ্রহ করিয়াও ছবি তৈয়ারি করিতে পারিতেন অথবা বিদেশী সরকারের নিকট অর্থানুকূল্য পাইলে সত্যজিৎবাবু ইচ্ছামতো শিল্পী ভারত হইতে লইয়া গিয়াও ফিল্ম তৈয়ারি করিতে পারিতেন। ইংরাজীতে সত্যজিৎরায়ের যথেষ্ট দখল ছিল। ইংরেজীতেও তিনি ইচ্ছা করিলে ছবি করিতে পারিতেন। হলিউড হইতে সিনেমা করিবার অফার পাইয়াও কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। এ জাতীয় সংযম নীরদবাবুর পক্ষে অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত নীরদবাবুর অবগতির জন্য জানাই রিচার্ড এ্যাটেনবোরো বৃটেনের লোক হইয়াও 'গান্ধী' ফিল্ম করিয়া পৃথিবীব্যাপী সাড়া জাগাইয়াছেন। 'সিটি অব্ জয়' সিনেমার বিষয় কলিকাতার দরিদ্র মানুষের জীবন। অথচ উহার শ্যুটিং হইয়াছে শ্রীলঙ্কায়। নীরদবাবুর যুক্তি যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে বিদেশে বসিয়া বাঙালী জীবন লইয়া লেখা তাঁহারও উচিত হয় নাই।

নীরদ চৌধুরী জানাইয়াছেন-'বিলাতবাসে প্রথম লাভ ঃ স্ত্রী-পুরুষে বাঁচিয়া আছি।'[৩০] এহেন স্বার্থপর ও অন্তঃসারশূন্য উক্তি কিন্তু আমরা নীরদবাবুর নিকট হইতে প্রত্যাশা করি না। আসলে অপরাধ করিলে ও তাহা ধরা পড়িলে মানুষ নির্লজ্জ হইয়া উঠে। তাহার ভাল-মানুষের মুখোশ খসিয়া পড়ে। এক্ষেত্রেও লেখক নীরদ চৌধুরীর তাহাই হইয়াছে। আমার এক প্রতিবেশীর কথা এইসূত্রে বলি। ভদ্রলোক অধ্যাপনা করেন এবং চশমা আঁটিয়া, দাড়ি রাখিয়া আপনাকে লেনিনের সমগোত্রীয় মনে করেন। কিন্তু বাড়িতে কাজের লোক রাখিবার বেলায় তাঁহার সাম্যবাদের প্রকাশ কিছু কম হইল। মাহিনাও যেমন কম পড়িতে লাগিল; খাদ্য, শয্যা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে আকাশ-পাতাল ফারাক হইতে লাগিল। পড়শিরা ইহা লইয়া নিন্দাবাদ করাতে লজ্জার মাথা খাইয়া তিনি বলিলেন— 'ঝি-চাকরের পেছনে সব টাকা ঢাললে আমার চলবে? বলি আমাদেরওতো খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে।' নীরদবাবু এবং তাঁহার স্ত্রীও বাঁচিয়াছেন। নীরদবাবুও আপনার স্বার্থ দেখিয়াছেন। মৃতপ্রায় বাঙালী জাতির সংস্পর্শ এড়াইয়া ভালভাবে বাঁচিবার জন্য বিদেশে গমন করিয়াছেন। কিন্তু শেষ বয়সে ইংরেজ জাতির অধঃপতনের কথাও তাঁহাকে লিখিতে হইল।

ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা' নামক চলচ্চিত্রে এইরূপ Irony দেখিয়াছি। উক্ত ছায়াছবিটিতে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যা চিত্রিত হইয়াছে। তাহাতে উদ্বাস্ত এক ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গীদের ফেলিয়া স্বার্থ-রক্ষার জন্য ঘাটশিলায় চাকুরি লইয়া গেলেন। অপর একজন মাস্টারমশাই কলোনির লোকদের ফেলিয়া স্বার্থপরের ন্যায় পলায়ন করিলেন না। পরিণামে দু'জনেই সামাজিক অবক্ষয়ে ডুবিলেন এবং নিয়তির হাত এড়াইতে পারিলেন না। পরবর্তীকালে মাস্টারমশাই কহিলেন 'তুমি পলাইয়াও বাঁচলানা। আমি লড়াই কইর‍্যা হাইর‍্যা গ্যালাম।' নীরদবাবুকেও মৃতপ্রায় বাঙালী ডাকিয়া আজ এই কথাটি বলিতে পারে।

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতে-'বিলাতে থাকিয়া দ্বিতীয় লাভ ঃ সুষ্ঠুভাবে গৃহস্থালি চালানো।'[৩১] অমিয়া চৌধুরাণীর ন্যায় সুগৃহিণী থাকিতে, ভারতে সুষ্ঠুভাবে গৃহস্থালি চালানো নীরদবাবুর পক্ষে অসম্ভব হইত—এমত বিশ্বাস হয় না। হয়তো পারিপাট্য কিছু কম হইত, কিন্তু সৌষ্ঠবের অভাব ঘটিত না। ইহার প্রমাণ তাঁহার দিল্লীবাসের সময় হইতেই মেলে। এমনকি কলিকাতায় নিতান্ত অর্থাভাবের মধ্যেও, নীরদবাবুর সহধর্মিণীর ভাষায়- "ওখানে ওঁর দুখানা ঘর ছিল। ঘর দুটো খুবই সুন্দরভাবে সাজানো। ঘরের এক-ধারে একটা 'ডিভান' সুন্দর রঙীন ছাপানো কাপড়ে ঢাকা। অন্যদিকের দেয়ালে বড় বড় কয়েকটা বইয়ের সেল্‌ফে বহু মূল্যবান সব বই ঝকঝক করছে। একটি ছোট টি-পয় সূক্ষ্ম কারুকার্যে খোদাই এককোণে রাখা ছিল এবং আরেক দেয়ালে একটি টেবিল ও চেয়ার, বসে লেখাপড়া করবার জন্য।"[৩২] সুতরাং দেখা যাইতেছে অর্থাভাব কখনো তাঁহার গৃহসজ্জায় রুচির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় নাই। দিল্লীতে আসিয়া বিলাতী কায়দায় খাওয়া-দাওয়ার চলন, এবং ক্ষুদ্র পরিসরে হইলেও পুষ্পপ্রীতির প্রকাশ ঘটিয়াছিল। পরবর্তীকালে ভারতে বাস করিলে তাঁহার গৃহস্থালি আরও সুষ্ঠু ও সুন্দর হইত, সন্দেহ নাই। অবশ্য বিদেশে নীরদবাবু ও তাঁহার স্ত্রী বিনা বেতনে সদ্বংশজাত বিদেশিনীর সেবা পাইয়াছেন, এবং প্রশ্ন করিয়াছেন-'কোন্ ধনী বাঙালীর মেয়ে এইভাবে আসিয়া একজন অসমর্থ বৃদ্ধার সেবা করিবে?'[৩৩] সম্ভবত বাঙালী সমাজের রীতির কথা দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকিয়া নীরদচন্দ্র ভুলিয়া গিয়াছেন। বাঙালী সমাজে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সেবার জন্য এখনও বাহিরের লোকের বিশেষ আবশ্যক হয় না। পুত্র, কন্যা,পুত্রবধূ ইহারাই আন্তরিকভাবে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দেখাশোনা করিয়া থাকে। কন্যার যদি ধনীগৃহে বিবাহ হয়, তথাপি সে আপনার বৃদ্ধ

পিতা-মাতার সেবা করিয়া থাকে। আবার পুত্রবধূ যদি সম্পন্ন ঘরের কন্যা হয়, তথাপি সে বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়িকে অবহেলা করে না। ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না, এমত নহে। কিন্তু ব্যতিক্রম দিয়া বিচার চলে না। স্নেহ-স্নিগ্ধ রূপই বাঙালী নারীর প্রকৃত রূপ। বিদেশিনীর রূপের ধাঁধায় অন্ধ হইয়া নীরদবাবুর তাহা দেখিতে পাইলেন না। বিবেকানন্দ দেখিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন-'ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্বে।'[৩৪] তাই কন্যা বা পুত্রবধু জননীরূপেই বৃদ্ধ পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করে। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে ইচ্ছা করি, আমার এক নিকটাত্মীয় কর্মোপলক্ষ্যে অন্যত্র বাস করেন। তাঁহার স্ত্রী একাই অথর্ব বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করেন এবং গৃহস্থালীর কর্ম তো বটেই, অধিকন্ত বাহিরের যাবতীয় কাজকর্ম হাসিমুখে করিয়া থাকেন। আমি প্রশ্ন করি- 'কোন্ বিদেশিনী পুত্রবধূ এইরূপে বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করিবে?' ব্যক্তি নীরদ চৌধুরী বোধহয় আমার এই প্রশ্নটি শুনিয়া মৃদু হাস্য করিবেন। কেননা, এতক্ষণ ধরিয়া আমি যাহা কিছু কহিলাম, কিছুই ব্যক্তি নীরদবাবুর অবিদিত নহে। কেবল লেখক নীরদ চৌধুরী উহা জানিতে চাহেন না। আর নীরদ চৌধুরী তো নিজেই কহিয়াছেন-'যে জানিতে চাহেনা, তাহাকে কিছুই জানানো যায় না।'[৩৫] সুতরাং আমিও লেখক নীরদ চৌধুরীকে কিছুই জানাইতে পারিলাম না। তবে এইটুকু বোধহয় বুঝাইতে পারিয়াছি যে, তাঁহার ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতার কথা আমরা জানি।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী কহিয়াছেন-'বিলাতবাসের তৃতীয় লাভ ঃ জীবিকার্জনের ভাবনা হইতে মুক্তি।'[৩৬] আমরা বরাবরই দেখিয়াছি ব্যক্তি নীরদবাবু যখন বহু কষ্টে জীবিকার্জনের উপায় করিয়াছেন, লেখক নীরদ চৌধুরী তাহাতে বাগড়া দিয়াছেন। ব্যক্তি নীরদ চৌধুরী কেরানির কাজ পাইয়া অকপটে স্বীকার করিয়াছেন-'উপার্জনহীন ও পরিবারের গলগ্রহ হইয়া থাকিবার গ্লানি হইতে মুক্তি পাইয়া চাকুরিতে ঢুকিবার পর কয়েক মাস বেশ সন্তুষ্টই ছিলাম। তাহার উপর কেরানির কাজেও দক্ষতা দেখাইয়া কিছু আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম।'[৩৭] কিন্তু নাক-উঁচু লেখক নীরদ চৌধুরী মনে করিলেন- 'সারাজীবন এই কাজ আমার জন্মগত প্রবৃত্তি ও শিক্ষাগত আদর্শের বিরোধী হইবে।'[৩৮] ফলে অফিসের কাজে তিনি শৈথিল্য দেখাইতে আরম্ভ করিলেন ও পরিশেষে চাকুরি ছাড়িলেন। এখন উক্ত সিদ্ধান্তের কথা লেখক নীরদ চৌধুরী সদম্ভে ঘোষণা করেন। কিন্তু সেদিনকার ব্যক্তি নীরদ চৌধুরী সাধারণ দুর্বল ভীরু বাঙালীর ন্যায় আপনার এই সিদ্ধান্তের কথা

পরিবারবর্গকে জানাইতে সাহস করেন নাই। তাঁহার 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' গ্রন্থে তিনি এ বিষয়ে বলিয়াছেন-'পরিবারের কাহাকেও জানাইলাম না যে চাকুরি ছাড়িয়া দিয়াছি।'[৩৯] সুতরাং বিলাতবাসকালে জীবিকার্জনের ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া যিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন ও তাহা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিতে ইতস্তত করেন নাই, তিনি ব্যক্তি নন, লেখক নীরদচন্দ্র। ব্যক্তি নীরদ চৌধুরী খুব সম্ভবত তাঁহার এই কর্মবিমুখতার কথা ভাবিয়া লজ্জা পাইয়াছেন। তাই লেখকের এই কৈফিয়তের অবতারণা। প্রসঙ্গত আরেকটি কথাও বলি, ১৯৭০ সনে—যে বয়সে নীরদবাবু স্থায়ীভাবে বিলেত বাস শুরু করিয়াছেন, ঐ বয়সে স্বদেশে থাকিলেও জীবিকান্বেষণের জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইত না। কেননা, চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের বয়স তিনি তখন অতিক্রম করিয়াছিলেন। বই লিখিয়াই তিনি স্বদেশে রোজগার করিতে পারিতেন। অবশ্য বিদেশের ন্যায় পারিশ্রমিক মোটা হইত না, স্বাচ্ছন্দ্যও কিছু কম হইত। কিন্তু নীরদবাবু তো গর্ব করিয়া জানাইয়াছেন 'টাকার প্রতি উদাসীনতা আমার অক্ষমতার একটা অলঙ্ঘনীয় দিক।'[৪০] উহা বোধহয় লেখক নীরদ চৌধুরীর শূন্যগর্ভ আস্ফালন। ব্যক্তি নীরদবাবু অর্থাসক্তিহীন হইতেই চাহিয়াছিলেন, লেখক নীরদ চৌধুরী হইতে দিলেন কই ?

নীরদ চৌধুরী কহিয়াছেন-'বিলাতবাসের চরম লাভ কৃত্যসাধনের অবকাশ।'[৪১] যে দেশে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় লেখক জন্মিয়া হাজার কাজের চাপের ভীড়ের মধ্যেও এত বৃহৎ পরিমাণ লিখিয়া গিয়াছেন, সে দেশের মানুষ হইয়া লেখক নীরদচন্দ্রের এই ঝুঁঠা কৈফিয়ৎ ব্যক্তি নীরদচন্দ্রকে প্রবোধ দিবার বৃথা চেষ্টামাত্র।

বিলাতবাস সম্পর্কে সর্বশেষ কৈফিয়ত দিতে গিয়া নীরদ চৌধুরী বলিয়াছেন-'বিলাতবাসের আনুষঙ্গিক লাভ মনোরঞ্জন।'[৪২] এই মনোরঞ্জন কি কি? না সখের বই পড়া, গ্রামোফোনে বাজনা শুনা, মধ্যবিত্ত হইয়াও বিলাসিতার চিন্তা করা এবং শারীরিক পরিশ্রম করা। বলা বাহুল্য, এর কোনটিরই অভাব স্বদেশে হইত না। তাছাড়াও লেখক নীরদ চৌধুরী আস্ফালন করিয়া বলিয়াছেন 'জীবনে কোনও বড় কাজ যেন তেন প্রকারেণ জীবন ধারণ করিয়াই হয় না।' ব্যক্তি নীরদ চৌধুরী কিন্তু স্বীকার করিয়াছেন- 'আমি অর্থাভাবকে সৌষ্ঠববর্জিত জীবন যাপনের সাফাই বলিয়া মনে করি না।'[৪৩] সম্ভবত, বিলাতবাসকেও তিনি ভারতে মনোরঞ্জনহীন জীবন -যাপনের সাফাই বলিয়া মনে করেন না। তাই লেখক নীরদচন্দ্রকে এই

বানানো সাফাই গাহিতে হইল। নতুবা যেন-তেন প্রকারেণ জীবন ধারণ করিয়াই চায়ের দোকানের কর্মচারী নজরুল 'নজরুল' হইয়াছেন, খবরের কাগজ বেচিয়া এডিসন বিজ্ঞানী হইয়াছেন, এইরূপ হাজারো উদাহরণ কি নীরদবাবুর জানা নাই ?

গ্রন্থ রচনা করিবার নিমিত্ত নীরদবাবু যে কৈফিয়তের সুদীর্ঘ তালিকা পেশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব কথিত একটি গল্পের কথা মনে পড়ে। উক্ত গল্পে একটি সাধু তাঁহার কৌপীন ইঁদুরে কাটে বলিয়া বিড়াল পুষিয়াছিলেন। বিড়ালের দুধের জন্য গাই পুষিয়াছিলেন। গরুর পিছনে কাজের জন্য একটি চাকর রাখিয়াছিলেন। এইভাবে ক্রমে তিনি জমি-জমা লইয়া মহাজন—ধনী বিষয়ীতে পরিণত হইয়াছিলেন। শেষে তাঁহার গুরুদেব আসিয়া যখন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন-'এসব কি?'[৪৪] শিষ্য বলিয়াছিল-'এসব যা দেখছেন সবই এক কৌপীনকা ওয়াস্তে।'[৪৫] সেইরূপ গ্রন্থ রচনার জন্য নীরদবাবু ক্রমে বিলাতে যাইলেন। তথায় গৃহী হইয়া বসবাস করিলেন। শৌখিনতায় মাতিলেন। বেশ দু'পয়সা করিলেন। তাহার পর যখন ব্যক্তি নীরদচন্দ্র আসিয়া প্রশ্ন করিলেন- 'এসব কি?' লেখক নীরদচন্দ্র কহিলেন-'এসব যা দেখছ, সবই এক কিতাবকি ওয়াস্তে।' উক্ত গল্পের সাধুটি অবশ্য গুরুদেবের প্রশ্নে সম্বিৎ ফিরিয়া আসায় গৃহ-সম্পদ ছাড়িয়া আবার সাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু ব্যক্তি নীরদের কথায় লেখক নীরদ তাঁহার বিদেশের প্রতিষ্ঠা ও সাচ্ছল্য ছাড়িয়া কেবল সাহিত্য-সাধনায় নিমগ্ন হইবেন, এরূপ আশা করা দুরাশামাত্র। আপনার সহিত আপনার বিবাদ তিনি মানিয়া লইতে প্রস্তত আছেন, কিন্তু লক্ষ্মীর সহিত সরস্বতীর বিবাদের যে প্রবাদ আছে, তাহা মানিতে তিনি কদাপি প্রস্তুত নন।

পাঠকবর্গ! আশা করি আপনারা বুঝিলেন, এ অধ্যায়ে আমি নীরদবাবুর বিলাতবাসের যুক্তি খণ্ডন করিতে বসি নাই। তাঁহার যুক্তির অসারতা দেখাইয়া আমি ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছি যে, ঐ সকল যুক্তিই ভিত্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও লেখক নীরদ চৌধুরীকে ঐ সকল যুক্তির শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে কেবল ব্যক্তি নীরদের নিকট আপনার অপরাধ স্খালনের জন্য। তাই ব্যক্তি নীরদ যেই সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করিলেন-'ঠাকুর ঘরে কে?' লেখক নীরদচন্দ্র সুপুষ্ট কদলী ভক্ষণ করিতে করিতে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিয়া উঠিলেন 'আমি তো কলা খাইনি।' হায়! এই বৃদ্ধ বয়সে নীরদবাবু আপনার সহিত আর কত লুকোচুরি খেলিবেন ?

## চতুর্থ অধ্যায়

# ময়ূরের পালক ধারণ করিলেই কাক ময়ূর হয় না

ময়ূরের পালক দিয়া আপনাকে ঢাকিয়া একটি কাক ময়ূর সাজিবার যে হাস্যকর প্রচেষ্টা করিয়াছিল, সেই গল্প আমাদের প্রায় সকলেরই জানা। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ হইয়াছে। ব্যক্তি নীরদ চৌধুরী দিব্য ছিলেন ভেতো বাঙালী, কিন্তু লেখক নীরদ চৌধুরীর ইংরাজী পড়িয়া, সাহেব-সুবোর বোলচাল দেখিয়া সাহেব সাজিবার শখ হইল। তাই সগর্বে ঘোষণা করিলেন-'আমি একাধারে বাঙালী ও ইংরেজ।'[৪৬] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তিনি না হইলেন পুরা ইংরেজ, না হইলেন পুরা বাঙালী-'হিজড়া' হইয়া রহিলেন। নপুংসক শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া অর্জুন যেরূপ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনার নপুংসক মূর্তিকে সম্মুখে খাড়া করিয়া লেখক নীরদ চৌধুরী ব্যক্তি নীরদ চৌধুরীর সহিত যুদ্ধে নামিলেন।

আপনার খাঁটি ইংরেজত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া নীরদ চৌধুরী অধ্যাপক এডোয়ার্ড শিলসের 'আমেরিকান স্কলার' নামক পত্রিকার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেখানে এডোয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছেন-'Mr. Chaudhuri being an Indian and a Bengali, and a European and Englishman, all at the same time, is unique,'[৪৭] সাহেবের পিঠ-চাপড়ানিতে নীরদবাবু খুশি হইলেন এবং অক্সফোর্ডে ডক্টরেট-প্রার্থিনী বাঙালী যুবতী তাঁহার এই ইংরেজত্ব লাভের কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলে, তাহা গায়ে মাখিলেন না। কেননা, বঙ্কিমচন্দ্র-কথিত 'ইংরেজস্তোত্রে'র ন্যায় তাঁহারও ইংরাজের প্রতি মনের ভাব এইরূপ 'আমার স্পীচ্ শুন, আমার এশে পড়, আমায় বাহবা দাও,-আমি তাহা হইলে সমগ্র হিন্দু সমাজের নিন্দাও গ্রাহ্য করিব না।'[৪৮] এ প্রসঙ্গে আমার

একটি বক্তব্য আছে। তাহা হইল এই যে, লেখক নীরদবাবু সাহেবের পিঠ চাপড়ানিতে ভুলিলেও ব্যক্তি নীরদ তাহাতে সান্ত্বনা পাইয়াছেন কি? পাইলে লেখক নীরদচন্দ্রকে তাঁহার ইংরেজত্ব প্রমাণের চেষ্টায় এতবড় একটি অধ্যায় লিখিতে হইত না। তাই লেখক নীরদ চৌধুরীর ক্ষুদ্র বক্ষ যখন সাহেবের প্রশংসায় স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, তখন উহার লজ্জাকর চাতুরীটুকু ব্যক্তি নীরদবাবুর চক্ষু এড়ায় নাই। শিশু যেমন বয়স্কদের ন্যায় জামাকাপড় পরিয়া, গোঁফ আঁকিয়া বড় হইবার সবিশেষ চেষ্টা করে; বড়রা স্নেহভরে তাহার দিকে ফিরিয়া কৃত্রিম বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলে-'বাঃ খোকা, তুমি কত বড় হয়ে গেছ। অফিস যাচ্ছ বুঝি?' সাহেবরা তদ্রূপ লেখক নীরদ চৌধুরীর সাহেব হইবার হাস্যকর ও প্রাণান্তকর প্রয়াস দেখিয়া স্নেহচ্ছলে তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়াছেন। লেখক নীরদ চৌধুরী উহা বুঝিলেন না। ব্যক্তি নীরদ বুঝিলেন, কিন্তু চুপ করিয়া রহিলেন। নপুংসক শিখণ্ডীকে দেখিয়া ভীষ্মের ন্যায় অস্ত্রত্যাগ করিলেন। প্রভেদ কেবল এই যে, ইহা যুদ্ধাস্ত্র নহে, বাক্যাস্ত্র।

নীরদবাবুর ভিতর সাহেবিয়ানা ও বাঙালীয়ানার টানাপোড়েন দেখিতে বেশ লাগে। ব্যক্তি নীরদ চিরাচরিত হিন্দু সংস্কার মানিয়া আর পাঁচটা বাঙালী যুবকের ন্যায় উপোস করিয়াছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'দিদিমার যুগ ও জীবন' গ্রন্থে তাঁহার স্ত্রী অমিয়াদেবী কহিয়াছেন-'বিয়ের পর শুনেছিলাম উনিও নাকি উপোসে ছিলেন।'[৪৯] কিন্তু অমিয়াদেবীর প্রদত্ত তথ্য হইতেই জানিতে পারি, লেখক-তথা সাহেব নীরদ চৌধুরী বাঙালীর ন্যায় মাথায় টোপর দিতে চাহিলেন না এবং সেলাই করা জামা খুলিতে চাহিলেন না। নীরদবাবু বিবাহও করিলেন সাধারণ বাঙালী অপেক্ষা বেশি বয়সে। সাধারণত ঐ বয়সে দন্তহীন বাঙালী দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিত না। কিন্তু নীরদবাবু ধার করিয়া দাঁত বাঁধাইলেন। এই কাজটি দিব্য সাহেবের মতো করিলেন, কিন্তু চক্ষুলজ্জাহীন বাঙালীর ন্যায় সেই ধার শোধ করিলেন না। অশোকবাবুর সুসজ্জিত গাড়ি দেখিয়া তাঁহার সাহেবী জাঁক দেখাইয়া ঐ গাড়িতে চড়িয়া বিবাহ করিতে যাইবার শখ হইয়াছিল। এ বিষয়ে তাঁহার সরল স্বীকারোক্তি-'কেমন সঙ্কোচ হইল, কিছুই বলিতে পারিলাম না।'[৫০] এই সঙ্কোচ বাঙালীর। আবার বিবাহের দানসামগ্রী দেখিয়া নীরদবাবুর হ্যাংলাপনাও বাঙালীর বইকি!—'বধূকে ক্ষণেকের জন্য দেখিয়া যত না আনন্দ পাইয়াছিলাম তাহার চেয়ে অনেক আনন্দ বোধ করিলাম দানসামগ্রী দেখিয়া।'[৫১] এহেন মানসিকতা ইংরেজের হইতেই

পারে না। নারীকে পার্থিব ভোগসামগ্রীর দ্বারা লাঞ্ছিত করিবার কথা তাহারা কল্পনাও করে না। কিন্তু বাঙালী নীরদবাবু তাহা তো করিলেনই, উপরন্তু শ্বশুরের সম্পত্তিতে তাঁহার স্ত্রীর সত্ত্ব কত পরিমাণ, তাহা জানিতেও কসুর করিলেন না। অথচ বিবাহের পর সাহেবী কায়দায় স্ত্রীকে লইয়া পৃথক বাসা করিলেন। আবার দায়িত্বজ্ঞানহীন বাঙালীর ন্যায় সংসার-পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যাপারে স্ত্রীর উপরই নির্ভর করিলেন। এমনকি স্ত্রৈণ, অক্ষম, অলস বাঙালীর ন্যায় স্ত্রীর বস্ত্রাঞ্চলে মুখ লুকাইয়া ক্ষমা চাহিতেও তাঁহার বাধিল না। নীরদবাবুর নিজের ভাষায়-'তাঁহার পায়ে জানু পাতিয়া বসিয়া, কোলে মুখ লুকাইয়া বলিলাম; আমাকে মাপ করো। তিনি কোনো কথা না বলিয়া শুধু আমার মাথার চুলে হাত বুলাইতে লাগিলেন।'[৫২] প্রিয়তমার নিকট জানু পাতিয়া বসা বিলাতী কায়দা বটে, কিন্তু মস্তকে স্ত্রীর হস্তস্পর্শে যে স্নেহের শতধা প্রকাশের নিকট নীরদ চৌধুরী আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহা একান্তই বাঙালীর। এ প্রসঙ্গে জানাই, স্বয়ং বিবেকানন্দ কহিয়াছেন-'পাশ্চাত্যে নারী স্ত্রী' এবং 'ভারতে জননীই আদর্শ নারী।'[৫৩] এই জননীর স্নেহধারাই ব্যক্তি নীরদচন্দ্র তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে প্রত্যাশা করিয়াছেন। অথচ প্রিয়তমা স্ত্রীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিবার স্বপ্নমুগ্ধ আকাঙ্ক্ষায় তিনি আপনার পাঞ্জাবীতে ধারালো বোতাম বসান নাই। সুতরাং আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, নীরদবাবু একাধারে বাঙালী ও ইংরেজ নন; আধাআধি বাঙালী ও ইংরেজ।—সুকুমার রায়ের 'খিচুড়ি' ছড়ার 'বকচ্ছপ মূর্তি' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই নীরদবাবুর এই দ্বিধাবিভক্ত দুই রূপের দ্বন্দ্ব কখনো ঘুঁচে নাই।

এতক্ষণ আমি নীরদচন্দ্র চৌধুরীর পরস্পর বিরোধী রূপটি দেখাইলাম। এক্ষণে দেখাই ইংরেজ হিসাবে তাঁহার নকলত্ব কোথায়। খাঁটি ইংরাজের বিশিষ্ট লক্ষণ হইল কথার দাম রাখা, সাহসের পরিচয় দেওয়া, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, কর্মপ্রিয়তা ইত্যাদি। ইহার কোনটিই নীরদ চৌধুরীর ভিতরে দেখিনা। প্রথমত, কথার দাম তাঁহার একেবারেই নাই। তাই টাকা ধার করিয়া প্রায় কখনোই সময়মতো শোধ করেন নাই। এমনকি একেবারে শোধ করেন নাই এমনও হইয়াছে। কেবল পয়সা-কড়ির ব্যাপারেই নহে, তিনি নির্দিষ্ট সময়ে লেখা শেষ করিতেও অপারগ হইয়াছেন। নীরদবাবুর 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' নামাঙ্কিত গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি, ১৯৭০ সনের শেষদিকে বইয়ের কোম্পানী প্রদত্ত টাকা প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে,

অথচ তিনি তখনো হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বই দূরে থাকুক, ম্যাকস্‌মূলারের জীবনীও শেষ করিতে পারেন নাই। কথার দাম তো নীরদবাবুর নাই-ই, উপরন্তু 'ভদ্রলোকের এক কথা' বলিয়া যে কথাটি প্রচলিত আছে, সেইমতো ভদ্রলোকও তিনি হইতে পারেন নাই;-সাহেব হওয়া তো দূরের কথা। প্রায়শই দেখি তিনি গ্রন্থের এক স্থানে যাহা কহিয়াছেন, অন্যত্র তাহার বিপরীত উক্তি করিতে তাঁহার বাধে নাই। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁহাকে দোষারোপ করা বাঞ্ছনীয় নহে। কেননা, উহা একক ব্যক্তি নীরদ চৌধুরীর কথা নহে; একটি লেখক তথা সাহেবীভাবাপন্ন নীরদচন্দ্রের কথা, অপরটি বাঙালী ব্যক্তি নীরদ চৌধুরীর কথা। যাঁহার সত্তাই দ্বি-খণ্ডিত, তাঁহার নিকট হইতে একই কথা প্রত্যাশা করা অন্যায় বৈকি। তাই আস্ফালন করিয়া লেখক নীরদ চৌধুরী যাহা কহেন, ব্যক্তি নীরদ চৌধুরী দুম করিয়া তাহার বিপরীত কথা বলিয়া বসেন। আসুন, নীরদবাবুর এই ধরনের কিছু উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য স্পষ্ট করি।

লেখক নীরদ চৌধুরী অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছেন বাঙালী পাঠকবর্গ তাঁহার নিন্দা করিলেও-'এসবের বিরুদ্ধে এবং আমার সপক্ষে আমি কখনও একটি কথাও লিখি নাই, অভদ্র গালির উত্তর দিই নাই, মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করি নাই।'[৫৪] অথচ তাঁহার নিন্দাকারীদের ভীতি প্রদর্শন করিতে তিনি ছাড়েন নাই।

'লেখনীকৃতকর্ণস্য কায়স্থস্য ন বিশ্বসেৎ।
বিশ্বসেৎ কৃষ্ণসর্পেষু, বনে ব্যাঘ্রেষু বিশ্বসেৎ।।'[৫৫]

উক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া বাঙালী কায়স্থ নীরদ চৌধুরী কহিয়াছেন-'আমাকে যাঁহারা ঘাঁটাইতে আসেন তাঁহারা যেন এই সংস্কৃত শ্লোকটি ভুলিয়া না যান।'[৫৬] কেবল ইহাই নহে, উক্ত নিন্দা সমূহের কৈফিয়ত দিতেও তিনি কসুর করেন নাই। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন-'কৈফিয়তগুলি প্রবন্ধ আকারে সাময়িকপত্রে নানা সময় প্রকাশিত হইয়াছিল।'[৫৭] বাঙালীর নিন্দা প্রসঙ্গে নীরদবাবু আরও বলিয়াছেন-'এই পুঞ্জীভূত নিন্দাতেও আমার কোন ক্ষতি হয় নাই-না খ্যাতিতে, না অর্থে, না আত্মপ্রসাদে, না সার্থকতার অনুভূতিতে......ইহার সমর্থন প্রকাশকেরা, সম্পাদকেরা এবং পুস্তকবিক্রেতারাও করিতে পারিবেন।'[৫৮] ইহা নীরদবাবুর আপনাকে ভুলাইবার ছেলেমানুষী প্রচেষ্টামাত্র। বস্তুত তাঁহার উক্ত নিন্দা সম্পর্কিত ক্ষোভ কদাপি ঘুঁচে নাই। তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছেন-''আমার 'ক্র্যামার' অপবাদ রহিয়া গেল।''[৫৯] এমনকি নিন্দার জ্বালায়

অতিষ্ঠ হইয়া তিনি কহিয়াছেন-'আমারও বলিতে ইচ্ছা হয়, কাটিতে চাও কাটিয়া ফেল, ছাড়িয়া দিতে চাও ছাড়িয়া দাও। কেবল এই পালা সাঙ্গ কর।'[৬০] সকল নিন্দা-অপবাদের ঊর্ধ্বে আপনাকে স্থান দিতে গিয়া লেখক নীরদ চৌধুরী আপনার অর্থ, খ্যাতি এবং বই বিক্রয়ের সংখ্যার উল্লেখ অবধি করিয়াছেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, অর্থ, খ্যাতির মোহলুব্ধ ব্রতচ্যুত লেখকদের নিন্দা তিনি করিয়াছেন এবং লেখার সংখ্যাগত নহে, গুণগত উৎকর্ষের প্রতি পক্ষপাত করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠকগণকে এ সম্বন্ধে অবগত হইবার জন্য নীরদবাবুর 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' নামক গ্রন্থের 'লেখকরা দুই চরিত্রের' শীর্ষক নিবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' গ্রন্থের এক স্থানে নীরদ চৌধুরী বড় মুখ করিয়া কহিয়াছেন-'আমার লেখাতে আর যাহাই থাকুক বা না থাকুক, তর্ক নাই।'[৬১] অথচ উক্ত গ্রন্থেরই অন্যত্র তিনি স্বীকার করিয়াছেন-'আমি তর্কের খাতিরে লম্ফঝম্প কিছু বেশি মাত্রায় করি।'[৬২] নীরদবাবুর এইরূপ স্ববিরোধে পূর্ণ আরও বহু উক্তি উদ্ধৃত করা যায়। কিন্তু আমার মতে আমার বক্তব্য সপ্রমাণের জন্য ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে।

কথার দামের প্রসঙ্গ তো আলোচিত হইল, এক্ষণে দেখিব ইংরাজের ন্যায় সাহসের পরিচয় তিনি কতটুকু দিয়াছেন, আদৌ দিতে পারিয়াছেন কিনা। বহু মিথ্যাকে অবশ্য ঢাক পিটাইয়া প্রচারিত করিয়াছেন নীরদবাবু শুধু সাহসের সহিত বলিব না, দুঃসাহসের সহিত। কিন্তু এই বেপারোয়া দুঃসাহসের জন্ম হইয়াছে তাঁহার বাঙালীসুলভ ভীতি হইতেই। উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্যকে সুবোধ্য করিতেছি। লেখক নীরদচন্দ্র গর্ব করিয়া কহিয়াছেন-'বনগ্রামের চৌধুরী হইয়া আমি অনুদারতা দেখাইতে পারি না, কাহারও সহিত আড়াআড়ি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিনা, ইত্যাদি।'[৬৩] প্রকৃতপক্ষে আপনার অনুদারতা, নীচ আচরণ, অর্থভিক্ষার প্রবণতা এবং ঈর্ষ্যাজাত প্রতিদ্বন্দ্বীমূলক মনোভাব সম্বন্ধে ব্যক্তি নীরদ চৌধুরী সচেতন। তাই পাছে কাহারও চক্ষে এই সত্য ধরা পড়ে, সেই ভয়ে তিনি এই সত্যকে চাপা দিবার জন্য অনাবশ্যক রকমের সাহসের বাড়াবাড়ি ঘটাইলেন। কেহ না জিজ্ঞাসিতেই আপনার গুণ গাহিতে বসিলেন। এ বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া মনে পড়িতেছে পাড়ার মেথর মুনিয়ার কথা। তাহার মদের বড় নেশা। সন্ধ্যের মুখে যদি তাহার সহিত কখনো সাক্ষাৎ হয়, দেখি সে একটি দুধের লোটা লইয়া আসিতেছে। মুখোমুখি হইলেই একগাল হাসিয়া

কিছু না জিজ্ঞাসিতেই কহে-'বাচ্চাদের জন্য দুধ নিয়ে এলাম দিদিমণি।' প্রথমে আমি উহা বিশ্বাস করিয়াছি। পরে বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়াছি, মুনিয়া দুধের লোটায় করিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় চোলাই মদ আনে। তাহার নেশার খরচ জুগাইতে গিয়া তাহার বাচ্চাদের দুধ খাইবার সুযোগ জুটে না। তাই তাহা চাপা দিবার জন্য মুনিয়ার এত আকুলতা। এই অসত্যভাষণকে কি বলিব?-সাহস, না সমাজের চক্ষে নীচু হইবার ভয়? নীরদবাবুকেও আমি একই প্রশ্ন করি। অবশ্য তাহার পূর্বে তাঁহার বক্তব্যের অসত্যতা প্রমাণ করিতে আমি পিছ-পা হইব না।

প্রথমত, অনুদারতা নীরদ চৌধুরীর চরিত্রের একটি বিশিষ্টতা আমি বলিব। তাই ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাহার বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের দিল্লী হইতে বিদায় করিতে স্বার্থপর নীরদ চৌধুরী ইতস্তত করেন নাই। তাঁহার সমর্থন না থাকিলে ভ্রাতৃবধূ ও তাহার সন্তানদের থাকার দরুণ দ্বিগুণ খরচায় পড়িয়া যে অসুবিধা হইতেছে, তাহার সংবাদ কখনো তাঁহার স্ত্রী কলিকাতায় লিখিয়া জানাইতেন না। চিঠির উত্তর পাইয়াই অবিলম্বে তাহাদের দিল্লী হইতে বিতাড়িত করিতেও নীরদবাবুর অনাগ্রহ ছিল তাহা কহিতে পারি না। অমিয়া দেবীর ভাষায়-'আবার সব পাততাড়ি গুটিয়ে ফেব্রুয়ারী মাসে পদ্মাদের সবাইকে কলকাতা রওয়ানা করিয়ে দিলাম।'[৬৪] রওয়ানা করিয়া দেওয়ার অর্থ তাঁহারা স্বেচ্ছায় যান নাই। জুলাই হইতে জানুয়ারী, মাত্র পাঁচ/ছয় মাস যাইতে না যাইতেই নীরদবাবুর উদারতা কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গেল। ইহাতে অবশ্য নীরদবাবুর সাহেবীয়ানার পরিচয় মিলিয়াছে। আত্মীয়-স্বজনের বোঝা আপনার স্কন্ধে বহন করিতে তিনি সাহেবদের মতোই নারাজ হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, নীরদবাবু ইংরাজের দোষটুকুই লইলেন, গুণ লইতে পারিলেন না। তবু এক্ষেত্রেও তাঁহার দ্বিত্ব রূপের কথা বলিব। যে নীরদ চৌধুরী বিপদগ্রস্থ আত্মীয়দের ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি বাঙালী নীরদ চৌধুরী—নীরদবাবুর ব্যক্তিরূপ। কিন্তু সাহেবী নীরদচন্দ্র তাঁহাদের বিদায় করিতে ইতস্তত করিলেন না। অসহায় আত্মীয়ের পিছনে ব্যয় করার চাইতে উৎকৃষ্ট ফরাসী সুরার পিছনে ব্যয় করিয়া তিনি নকল অভিজাত্যের সুরাপান করিলেন। মেথর মুনিয়ার মতোই আপনার নেশা জোগাইবার নিমিত্ত অনাথ শিশুদের দুগ্ধ হইতে বঞ্চিত করিলেন।

দ্বিতীয়ত, নীচ আচরণও নীরদচন্দ্র কিছু কম করেন নাই। আপনার মাতৃদেবীকে কটুবাক্য দ্বারা লাঞ্ছিত করিতে তাঁহার বাধে নাই। ইহাতে

দুঃখ পাইয়া তাঁহার মাতা, পিতার নিকট অভিযোগ করিলে তিনি পিতার শাসনের উত্তরে স্পর্ধা করিয়া কহিয়াছেন—'এতে অন্যায় কি হয়েছে?'[৬৫] মাতা-পিতার প্রতি হিন্দু সন্তান হইয়া এইরূপ নীচ আচরণ করিবার একমাত্র কারণ ইংরেজীয়ানার মোহে ধরাকে সরা জ্ঞান করা। অথচ বিবাহের বেলায় বাঙালী যুবকের ন্যায় উক্ত পিতৃ দেবতার শরণাগত হইতে তাঁহার বাধিলনা—'অবশেষে ১৯৩১ সনের নভেম্বর মাসে পিতার চরণে পড়িয়া আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে অনুরোধ করিলাম।'[৬৬] শাশুড়ি বাঙালীর মাতৃস্থানীয়া। সেই শ্বশ্রূমাতার প্রতি নীরদবাবু যে আচরণ করিয়েছিলেন, তাহাও অত্যন্ত নিন্দার্হ। নীরদবাবুর শিশুপুত্রকে তাঁহার মাতামহী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিতে গেলে নীরদচন্দ্র কহিয়াছিলেন-''আপনি আমার ছেলে-পিলে নিয়ে 'মেড্‌ল্‌' করেন যদি তাহলে আপনাকে আমার বাড়ি আসতে দেবনা।''[৬৭] এইরূপ অসভ্য আচরণ কিন্তু বাঙালী বা ইংরাজ কেহই সাধারণত করেনা। বিশেষত ইংরেজরা তো মৌখিকভাবে অত্যন্ত ভদ্র। ইহা ছাড়াও আরও সাম্প্রতিক ঘটনার কথা কহি। বাংলার লেখিকা নবনীতা দেবসেন কেতকী কুশরী ডাইসনকে লইয়া নীরদবাবুর দর্শনার্থী হইবার প্রত্যাশী হইয়াছিলেন। অভদ্র নীরদবাবু কেতকী কুশারী ডাইসনকে তাঁহার নিকট আসিবার অনুমতি দেন নাই। কেননা, 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীমতী ডাইসন নীরদবাবুর কিছু অপ্রীতিকর সমালোচনা করিয়া ছিলেন। ইহাকেও কি উদারতা এবং মহৎ আচরণ বলিব?

তৃতীয়ত, 'অর্থভিক্ষা করিনা' বলিয়া নীরদবাবুর যে আস্ফালন করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই হাস্যকর। ঋণভারে জর্জরিত নীরদচন্দ্রের ঋণশোধ করিতে হইয়াছে তাঁহার ডাক্তার ভাইকে। নীরদবাবু স্বয়ং কহিয়াছেন-'ঝি ও বাড়িওয়ালা আমার ডাক্তার ভাই-এর ঠিকানা বাহির করিয়া তাহার কাছ হইতে পাওনা আদায় করিল।'[৬৮] এমনকি পাস্‌কালের গ্রন্থাবলীর মূল্য পরিশোধ করিবার জন্য ধনী আত্মীয়ের নিকট কাকুতি-মিনতি করিয়া হাত পাতিতেও তাঁহার বাধে নাই। তাঁহার পিতাকে সে ঋণ পরিশোধ করিতে হইয়াছে। ভ্রাতাদের গলগ্রহ হইয়াও নীরদবাবু কাল কাটাইয়াছেন। ইহাও অর্থভিক্ষার নামান্তর মাত্র। ইহা ব্যতীত বিবাহের সময় ধার করিয়া দাঁত বাঁধানো এবং উক্ত ঋণ পরিশোধ না করিবার কথা তো পূর্বেই বলিয়াছি। এ সবই অবশ্য প্রাক্-বিবাহ কালের কথা। কিন্তু বিবাহের পরও নীরদবাবুর এইরূপ অর্থভিক্ষা করিবার স্বভাব গেল না। স্ত্রীর উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার সংসার চলিল। ভাই বিনুর রোজগারের

সর্বস্ব একটি করে টাকা প্রতিদিন গ্রহণ করিতেও নীরদবাবুর কিছুমাত্র সঙ্কোচ হইল না। উপরন্তু উক্ত সময়ে তাঁহার ভাই হারু অকস্মাৎ চাকুরী হারাইয়া সপরিবারে তাঁহার নিকট আসিতে চাহিলে স্বার্থপর নীরদ চৌধুরী বোঝাইতে কসুর করিলেন না যে, 'এখন আনলে সবার খুবই কষ্ট অসুবিধা হবে, কারণ বিনুর ঐ একটি টাকা দিনে ভরসামাত্র।'[৬৯] নীরদবাবু মনে করিলেন ভাইদের মধ্যে বিনুর টাকার উপর তাঁহারই একমাত্র দাবী। সুতরাং আলোচনা করিয়া দেখিতেছি, অর্থানুকূল্য লইবার বেলায়, আশ্রয় খুঁজিবার বেলায় নীরদ চৌধুরী অবশ্যই বাঙালী। কিন্তু আশ্রয় দিবার বেলায় তিনি সাহেব বৈকি। ফল কথা, নীরদবাবু একাধারে ইংরাজ ও বাঙালী নন-কখনো ইংরাজ, কখনো বাঙালী। সুযোগ বুঝিয়া বহুরূপীর মতো অনবরত রং বদলাইতেছেন।

চতুর্থতঃ, আড়াআড়িতেও নীরদ চৌধুরী কিছু কম যান নাই। মনোবিজ্ঞানীরা নীরদবাবুর ন্যায় এইধরনের ব্যক্তিত্বের নাম দিয়াছেন- 'Narassistic personality.' মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ নন্দীর ভাষায়-' সব বিষয়েই এরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে। অন্যের সাফল্যকে এরা ঈর্ষার চোখে দেখে।'[৭০] এই শ্রেষ্ঠত্বের বোধ আবার অনেক সময় জাগিয়া উঠে হীনমন্যতা হইতে অর্থাৎ কোন একটি ব্যাপারে মানুষ হীনমন্যতায় ভুগিলে উক্ত দুর্বলতাকে চাপা দিবার জন্য অপর সকল বিষয়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে থাকে। উক্ত প্রক্রিয়ানুসারে নীরদবাবুরও ঈর্ষ্যার জন্ম হীনমন্যতা হইতে। আপনার কালো, ছোটোখাটো চেহারার জন্য নীরদবাবুর আফশোস্ কিছু অধিক দেখা যায়। তাঁহার ন্যায় বিদগ্ধ পণ্ডিতের নিকট হইতে এই রূপমোহের দুর্বলতা প্রত্যাশিত নহে। কিন্তু নীরদবাবু এ দুর্বলতা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। আর সেই কারণেই আপনার অগ্রজ ভ্রাতার দেহকান্তি দেখিয়া হীনমন্যতায় ভুগিয়াছেন এবং কেহ ভুলক্রমে তাঁহাকে তাঁহার অগ্রজজ্ঞানে সম্বোধন করিলে কহিয়াছেন- 'একদিকে অন্তত দাদার সমকক্ষ হইতেছি মনে করিয়া উৎসাহ বোধ করি লাম।'[৭১] সত্যজিৎ রায়ের লম্বা-চওড়া চেহারাও নীরদবাবুর চক্ষুশূল হইয়াছিল। তাই যদ্যপি তিনি বিনয় করিয়া কহিয়াছেন-'আমি কোনোদিকে সত্যজিৎ রায়ের সহিত তুলনীয় নই, যেমন নই দৈহিক আকৃতিতে, তেমনই নই বৃত্তিতে।'[৭২] কিন্তু এই বিনয়ের কপটতা ধরা পড়িতে সময় লাগে না। ইহার প্রমাণ পাই নীরদ চৌধুরীর পরবর্তী উক্তিতে-'তাঁহাকে অনিচ্ছায় হইলেও ভারতে থাকিতে হইত, নহিলে তিনি 'অস্কার' পাওয়া

দূরে থাকুক, ফিল্‌ম-ও তৈরি করিতে পারিতেন না।'[৭৩] সত্যজিৎবাবুর দেশকালাতীত প্রতিভাকে নীরদবাবুর ঈর্ষাই ছোট করিতে চাহিল। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় নীরদচন্দ্রকে জনৈক ভদ্রলোক 'pigmy' আখ্যা দেওয়াতেও নীরদবাবুর রাগ কিছু কম হয় নাই। তিনি ক্রোধভরে বলিয়াছেন—'আমি অবশ্য দেহের আকারে রবীন্দ্রনাথের কাছে pigmy, তবে বুদ্ধিতে এত বিভিন্ন তাহা স্বীকার করিব না।'[৭৪] এক্ষেত্রেও আপনার বহিরঙ্গের কুরূপতার কথা নীরদবাবুর বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। সুতরাং ইংরাজী সভ্যতার অন্তরঙ্গ নয়, বহিরঙ্গ রূপই নীরদবাবুকে বিশেষ আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি বিলাসে-ব্যসনে, বসনে-ভোজনে ইংরাজ হইয়াছেন; চরিত্রধর্মে হন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্যে'র অন্তর্গত 'ইংরাজস্তোত্র'ই যেন নীরদবাবু পাঠ করিয়াছেন-'আমি বুট প্যান্টলুন পরিব, নাকে চস্‌মা দিব, কাঁটা চাম্‌চে ধরিব, টেবিলে খাইব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।'[৭৫]

তাই দিল্লীতে যাইয়া সাহেবী কায়দায় খাওয়া-দাওয়া চালু করিতে নীরদ চৌধুরী ইতস্তত করেন নাই। উক্ত সাহেবীয়ানার কথা তিনি সদম্ভে প্রচার করিতেও ছাড়েন নাই। 'প্রবাসিনী দিদিমা' গ্রন্থে অমিয়া চৌধুরী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-"টেবিলে বসিয়ে বিলিতি পদ্ধতিতে কাউকে ডিনার বা লাঞ্চ খাওয়াবার সময় সঙ্গে ওয়াইনের ব্যবস্থা করা হত এবং সকলকে বলতেন, 'আমাদের বাড়িতে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে বসে ওয়াইন খাই।'"[৭৬] এই প্রচারধর্মিতা নীরদ চৌধুরীকে কখনো ছাড়ে নাই। তাই যাঁহাকেই তিনি ঈর্ষা করিয়াছেন, তাঁহার প্রসঙ্গ টানিয়া আনিয়া ঢাক পিটাইয়া আপনার প্রচার শুরু করিয়াছেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর গল্পের বাঘা বাইনের মতো তাঁহার ঢোলক বাজাইবার প্রবল অত্যাচারে কানে তালা লাগিয়া যাওয়ায় বাঙালী তাঁহাকে দেশ হইতে একরকম বিতাড়িতই করিল। কিন্তু ভূতের রাজার বরের ন্যায় সাহেবের নিকট প্রশংসা ও পুরস্কার পাইয়া বাঘা নীরদ চৌধুরী এখন দ্বিগুণ উৎসাহে ঢোলক পিটাতেছেন। জওহরলাল নেহেরুর উপর সবিশেষ হিংসার ফলে নীরদবাবু এই ঢোলক পিটাইবার আয়োজন কিছু বেশি করিয়াছেন। নীরদ চৌধুরী জানাইয়াছেন যে, আত্মজীবনীটি লিখিয়া তিনি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর বিশেষ অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন এবং নেহেরুর কোপের খাঁড়া তাঁহার ঘাড়ে সজোরে পড়িয়াছিল। তাই ব্যক্তিগত ক্রোধে ও ঈর্ষাবশে নীরদবাবু নেহেরুকে এবং নেহেরুর প্রতিভাকে খাটো করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইতে চাহিয়াছেন। আপনার আত্মজীবনীটি প্রসঙ্গে

তিনি কহিয়াছেন- 'উহা প্রকাশের পরই বিলাতে যেভাবে প্রশংসিত হইয়াছিল ও যেভাবে আলোচিত হইয়াছিল তাহা ইহার পূর্বে কোন ভারতীয়ের লেখা ইংরাজী বইয়ের বেলাতে দেখা যায় নাই, এমন কি জবাহরলাল নেহেরুর আত্মজীবনীর জন্যেও নয়'।[৭৭] এইসব ব্যক্তিগত ঈর্ষার কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, অধ্যাপক পদের প্রতি নীরদচন্দ্রের ঈর্ষা প্রবল। ইহার কারণও বাঙালী-সুলভ ভীতি। পাছে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করিতে না পারেন এই ভয়ে নীরদবাবু এম. এ. পরীক্ষা দেন নাই।' তাঁহার ভাষায়- 'বি.এ. অনার্স-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছিলাম, এম. এতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ করিলে যে শুধু লজ্জার বিষয় হইবে তাহাই নয়, জীবিকার দিক হইতেও অনিষ্ট হইবে।'[৭৮] এইরূপে এম. এ. পরীক্ষা দিতে অপারগ হইবার ফলে নীরদ চৌধুরীর অধ্যাপনা করিবার স্বপ্ন মরীচিকায় পরিণত হইল। নীরদবাবু বলিয়াছেন 'ইহাতে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি যেন ধ্বসিয়া পড়িল। অল্পবয়স হইতেই জীবনের কৃত্য জীবিকা সম্বন্ধে ধারণা ছিল এম. এ. পাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কোনো কলেজে অধ্যাপকত্ব করিব ও জীবনের কৃত্য হিসাবে ঐতিহাসিক গবেষণা করিব।'[৭৯] ইহার সম্ভাবনা রহিল না। ফলে আঙুর ফল টক হইল। যাঁহারাই অধ্যাপক হইলেন, তাঁহাদের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিতে নীরদ চৌধুরী দ্বিধা করিলেন না। একটি ব্যঙ্গচিত্রে তিনি হনুমানের জায়গায় প্রফেসরকে বসাইতে চাহিলেন-'আজিকার দিন হইলে এই ব্যঙ্গচিত্রে অর্বাচীন যুবককে হনুমানরূপে না দেখাইয়া প্রাচীন প্রফেসর বা সেক্রেটারিকে দেখাইতাম।'[৮০] বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কেও নীরদবাবুর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি কহিয়াছেন—'তাঁহাকে শুধু বাঙালী জীবনের ক্ষুধিত পঙ্ক গ্রাস করে নাই, যাদবপুরের বাদাও তাঁহাকে কবিপদ হইতে অধ্যাপকপদে নামাইয়াছিল।'[৮১]

সুতরাং এইরূপে দেখা গেল নীরদ চৌধুরী আপনার যে প্রশংসাপত্র পেশ করিয়াছিলেন, তাহা সর্বৈব মিথ্যা। আমার এক প্রতিবেশিনীকে দেখিয়া এই মিথ্যাভাষী লেখক নীরদ চৌধুরীর কথা মনে পড়ে। উক্ত ভদ্রমহিলা অনর্গল মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন এবং বড়াই করিয়া বলেন— 'আমি নিজে মিথ্যে বলিনা। তাই কেউ মিথ্যে কথা বললে সহ্য করতেও পারি না।' বলা বাহুল্য, তাঁহার এই স্বভাবের জন্য আমরা তাঁহাকে সহ্য করিতে পারি না, এবং খুব সম্ভব ব্যক্তি নীরদের নিকটও লেখক নীরদের এই মিথ্যাভাষণ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তি নীরদের নিকট লেখক

নীরদের মিথ্যা পদে পদে ধরা পড়িয়াছে, তবু বড়াই করিতে তিনি ছাড়েন নাই। ছেলেবেলায় যাত্রাপালায় ভীমের বড়াই করিবার প্রবণতা দেখিয়া বালক নীরদ হাস্যরসে আপ্লুত হইতেন। এক্ষণে লেখক নীরদচন্দ্রের বড়াই দেখিয়া ব্যক্তি নীরদ কি হাস্য করেন না? ভীমকে লইয়া যেমন গান বাঁধা হইত—

'বাহবা বাহবা কেয়া মজাদার ভীম!
তানা নানা তানা নানা তানা নানা ধিন।
আচ্ছা কি ঠাণ্ডা বেলেল্লা গুণ্ডা
প্রাণটা করে দিলে হিম,
আসলে পাজি কড়া মেজাজী
বদ আওয়াজী ভীম,
তানা নানা তানা নানা তানা নানা ধিন।'[৮২]

নীরদ চৌধুরীকে লইয়াও সেইরূপ ছড়া বাঁধিলে মন্দ হয় না-

'বাহবা বাহবা কেয়া নীরদ চৌধুরী
নিজের প্রশংসা নিজে করে ঝুড়িঝুড়ি
বাপ্‌রে কি বিটলে কায়স্থ বুড়ো
দাঁত মোটে নেই তবু চিবাবেই মুড়ো।'

এতক্ষণ নীরদবাবুর সাহেবের ন্যায় কথার দাম ও সাহস—কোনটিইযে নাই, তাহা দেখাইলাম। এক্ষণে সাহেবের ন্যায় স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও কর্মপ্রিয়তা তাঁহার আছে কিনা দেখিব। সংক্ষেপেই বলি, নীরদবাবু যে স্বাধীনতা প্রিয় ছিলেন, তাহাতে ভুল নাই। তাই পরাধীন হইয়া চাকুরি করিতে চান নাই। বিবাহের পরও পিতার অধীন থাকেন নাই। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, নীরদবাবুর স্বাধীনতা ছদ্মবেশে স্বেচ্ছাচারিতা। খামখেয়ালীপণা করিয়া বেড়াইবার নাম স্বাধীনতা নহে। আপনার ইচ্ছামতো চলিবার জন্য পরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই। এমন কি, চাকুরি ছাড়িয়া বাউণ্ডুলেপণা করিয়া তিনি সংসারে যে দারিদ্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে ব্যাপারে তাঁহার স্ত্রী একটি কথা বলিলেও তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বাপের বাড়ি রাখিয়া আসিতেন বলিয়া জানাইয়াছেন 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' শীর্ষক গ্রন্থে। সুতরাং স্ত্রীকে তিনি বাক্-স্বাধীনতা দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কেবল ইহাই নহে, তাঁহার স্ত্রীর চাকুরির

প্রস্তাব আসিলে তিনি তাহা খারিজ করিতে ইতস্তত করেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার স্ত্রী 'প্রবাসিনী দিদিমা' গ্রন্থে জানাইয়াছেন যে, নীরদবাবু স্পষ্টই বলিয়াছিলেন-'কয়টা কারণে তোমার গিয়ে খবর পরায় আমার বিশেষ আপত্তি.....এ আমি কিছুতেই হতে দিতে রাজী নয়।'[৮৩] সাহেবরা স্ত্রী-পুরুষ সকলে স্বাধীন। সেখানে অপরের স্বাধীনতায় এইরূপ হস্তক্ষেপ করিবার প্রশ্নই উঠে না।

আর সাহেবদের কর্মপ্রিয়তা প্রসঙ্গে বলিব, নীরদবাবুর কর্মবিমুখতার বিষয়ে আর কি কিছু বলিবার প্রয়োজন আছে? 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' গ্রন্থে 'অক্ষমের ক্ষমতা' শীর্ষক অংশে আপনার এই অক্ষমতার কথা তিনি জানাইয়াছেন। চাকুরি পাইয়াও কর্মে ফাঁকি দিবার কথা ও শেষে চাকুরি ত্যাগের কথা তিনি গোপন করেন নাই। তদুপরি 'কেন আমি বিলাতে আছি' জানাইতে গিয়া কর্মহীন অবসর প্রাপ্তির জন্য ইংরাজ সরকারকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। স্পষ্ট বলিয়াছেন 'বিলাত বাসের তৃতীয় লাভ জীবিকার্জনের ভাবনা হইতে মুক্তি।'[৮৪] অবশ্য একটি কাজ নীরদ চৌধুরী করেন—তাহা ঐতিহাসিক অনুসন্ধান। কিন্তু তাহাও ঐতিহাসিক জায়গায় ভ্রমণ করিয়া, প্রত্নতত্ত্বমূলক গবেষণার শারীরিক শ্রম করিয়া নহে; ঘরে বসিয়া লিখিয়া ও বই পড়িয়া। প্রয়োজনীয় বই দেশে জোগাড় করিতে পাছে পরিশ্রম হয়, তাই তিনি বিদেশেই বসবাস করিয়াছেন এবং নিজেই স্বীকার করিয়াছেন 'আমি দিনে চার ঘন্টার বেশি কখনও কাজ করিনা।'[৮৫] আশা করি নীরদবাবুর সাহেবীয়ানার পরিচয় যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে, এইবার তাঁহার বাঙালীয়ানার পরিচয় দিব।

নীরদ চৌধুরী তাঁহার খাঁটি বাঙালীয়ানা বুঝাইতে গিয়া শৈশবে পাঁঠা-বলির স্মৃতিচারণা করিয়াছেন, সেইসঙ্গে এও জানাইয়াছেন যে, মামাবাড়ি বৈষ্ণব হওয়ায় সেখানে কুমড়া-বলিও দেখিয়াছেন। লক্ষণীয় এই যে, বৈষ্ণবের ক্ষমা ও অহিংসাভাবের সহিত যীশুখ্রীষ্টের বাণীর সাদৃশ্য প্রচুর। আবার শাক্ত ধর্মের সমুগ্র কাঠিন্য ও দৃঢ়তা হিন্দু ধর্মের প্রাণস্বরূপ। এ বিষয়ে বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, '.........গীতার উপদেশ শুনলে কে ? না ইউরোপী, আর যীশুখ্রীষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কাজ করছে কে ? না কৃষ্ণের বংশধরেরা'[৮৬] তাই শৈশবেই নীরদবাবুর চরিত্রে খৃষ্ট ও হিন্দুধর্ম এই দুই ধর্মের বীজই প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। ফলে তিনি দ্বিচারী হইলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বও দ্বিধা বিভক্ত হইল। তিনি দুই নৌকায় পা দিয়া ডুবিলেন।

অবশ্য প্রবাসে গিয়া পুনরায় ধুতি পাঞ্জাবি পরিধান করিয়া নীরদ

চৌধুরী এক্ষণে আপনাকে 'খাঁটি বাঙালী' প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু ইহাও কেবল বহিরঙ্গে বাঙালী হইবার প্রয়াস। বিবেকানন্দ তো কহিয়াই ছেন 'বলি, কাপড়ে কি মানুষ হয়, না মানুষে কাপড় পরে ?[৮৭]' তবু নীরদবাবু এতটুকু করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সাহেবী পোষাকের মোহ তাঁহার ভালমতই ছিল। তাহা সত্ত্বেও তিনি যে বাঙালী পোষাক পরিধান করিলেন, তাহার দুইটি কারণ আছে। একটি কারণ এখন কহিব, অন্যটি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

পরশুরামের 'কচি সংসদে'র কেষ্ট নির্লিপ্ত দুই সুশিক্ষিত নরনারীর মতামত যাচাই করিয়া প্রেমহীন অথচ যুক্তিনির্ভর বিবাহে পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু বিবাহের পাত্রী পদ্মকে দেখিয়া তাহার নির্লিপ্ততা কিছু ঘুচিল। কেষ্টর কিম্ভূত সাজ পোশাকের উপর কটাক্ষ করিয়া পদ্ম যখন ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিল—'যেন একটি সঙ'! কেষ্ট তাহার 'ইম্পিরিয়াল' দাড়ি, যাহা নাকি 'নাকটা ব্যালান্স' করিবার উদ্দেশ্যে রাখিয়াছিল, তাহার বৈজ্ঞানিক উপযোগিতার কথা ভুলিয়া; 'মানুষের চুল অনাবশ্যক' এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি বিস্মৃত হইয়া ব্যস্ত হইয়া রফা করিল—'তা-তা আমি না-হয় মাথার চুলটা এক ইঞ্চি বাড়িয়ে ফেলব, আর দাড়িটাও না-হয় ফেলে দেব। আচ্ছা এই হাত দিয়ে দাড়িটা চেপে রাখলুম—এইবার দেখ তো পদ্ম।'[৮৮]

নীরদবাবুর দুইটি সত্তার কথোপকথনকেও এইরূপে সাজানো যায়—বাঙালী নীরদ সাহেব নীরদের কোট-প্যান্টের বাহার দেখিয়া নাক কুঁচকাইয়া কহিলেন 'অমন সং সেজে থেকোনা।' ইহাতে সাহেবী নীরদ লজ্জা পাইয়া বলিলেন—'তা-তা আমি না হয় কোট খুলে রাখছি। প্যান্টও ছাড়তে রাজী আছি। আর তুমি যদি চাও তো ধুতি-পাঞ্জাবীও পরতে পারি।' কেষ্ট যেমন দাড়ি চাপিয়া ধরিয়াছিল, নীরদবাবু তেমনি আপনার বিদেশী পোশাক পরিচ্ছদকে একখানা ধুতি সামনে ধরিয়া আড়াল করিয়া বলিলেন—'এইবার দেখ তো ভাই নীরদ, পছন্দ হয় কিনা।'

## পঞ্চম অধ্যায়

# চেনা বামুনের পৈতে লাগেনা

কথায় বলে 'চেনা বামুনের পৈতে লাগেনা।' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বলিয়া যিনি সুপরিচিত, পৈতে দেখাইয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ প্রদান করিতে হয়না। নীরদ চৌধুরী এই পৈতাটি কিছু বেশি দেখাইয়াছেন। কথা নাই, বার্তা নাই, কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিল কিনা তাহার অপেক্ষা নাই, ফস্ করিয়া পৈতাটি বাহির করিয়া আস্ফালন করিয়াছেন 'আমি খাঁটি বাঙালী' 'খাঁটি সাহেব'[৮৯] ইত্যাদি। অর্থাৎ যাবতীয় নির্ভেজাল বস্তুর আধার তিনি। আপনার নির্ভেজালত্ব সম্পর্কে আপনারই সন্দেহ থাকায় বারংবার তাঁহাকে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হইয়াছে। কেননা, আর কাহারও নিকট ফাঁকি দেওয়া চলিলেও আপনার নিকট আপনাকে ধরা পড়িতেই হয়। আপনার নিকট আপনি ধরা পড়িয়া নীরদবাবু এতদূর চটিয়াছেন যে, কেবল পৈতা দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ব্রহ্মশাপের ভয়ও দেখাইয়াছেন।

'লেখনীকৃতকর্ণস্য কায়স্থস্য ন বিশ্বসেৎ।
বিশ্বসেৎ কৃষ্ণসর্পেষু, বনে ব্যাঘ্রেষু বিশ্বসেৎ।।'[৯০]

উক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন—'আমাকে যাঁহারা ঘাঁটাইতে আসেন তাঁহারা যেন এই সংস্কৃত শ্লোকটি ভুলিয়া না যান।'[৯১] বস্তুত নীরদবাবুকে লইয়া সর্বাপেক্ষা ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছেন নীরদবাবু নিজেই। তাই তাঁহার এই কৈফিয়ৎ ও আস্ফালনের এত আয়োজন করিতে হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে নীরদবাবুর ব্রহ্মশাপ আপনারই উপর পড়িয়াছে। প্রসঙ্গত একটি গল্প বলি। পুরাণে বর্ণিত বৃকাসুর শিবঠাকুরের নিকট বর পাইয়াছিল যে, যাহার মাথায় সে হাত রাখিবে সেই পুড়িয়া ছাই হইয়া

যাইবে। দুষ্ট অসুর সেই বর পাইয়া বরদাতা ভোলানাথের মাথায় হাত দিবার জন্য তাঁহাকেই তাড়া করিল। তখন ভগবান বিষ্ণু আসিয়া বৃকাসুরকে কহিল—'শিব ঠাকুর এখন আর তেমন বড়-সড় ঠাকুর নন। তাঁর দেওয়া বর ফলবে, এ তুমি ভাবলে কি করে ? খামোকা ওনার পিছনে না ছুটে আগে নিজের মাথায় হাত দিয়ে দ্যাখো না ওই বর সত্যি কিনা।' অমনি বোকা অসুর ভাবিল 'তাই তো পরীক্ষা করে দেখি।' ব্যস আপনার মস্তকে হাত রাখিতেই বৃকাসুর পুড়িয়া ছাই হইল। নীরদবাবুও সেইরূপ আপনাকে ব্রহ্মশাপ দিয়া আপনারই শিরে হস্ত স্থাপন করিলেন।

নীরদবাবুর চেহারাটি চক্ষে পড়িবার মত নহে বলিয়া তাঁহাকে বামুনের পৈতার ন্যায় স্বীয় সাজ-পোশাকের দ্বারা অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইয়াছে। তিনি স্বয়ং কহিয়াছেন, শাশুড়ি-ঠাকুরাণীর বিবাহের বেণারসীটি পরিয়া তিনি রাস্তায় বাহির হইতেন। তাঁহার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি 'সঙ সাজিবার আরও প্রয়াস করিলাম।[৯২]' ব্রহ্মদেশের রঙীন ছাতা মাথায় দিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। কেবল সাজ পোশাকেই নয়, সাধ্যাতীত আসবাব-পত্র কিনিয়া, সর্বশ্রেষ্ঠ ওয়াইন কিনিয়া তিনি আপনাকে জাহির করিতে চাহিয়াছেন। আপনাকে সর্বদা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন 'এই গর্ব থাকার জন্য আমি কখনোই সাম্যবাদী হইতে পারি নাই।[৯৩]' প্রসঙ্গত, মনো বিজ্ঞানী এ্যাড্‌লারের মতটি কহিতেছি। তিনি বলিয়াছেন যে, শারীরিক হীনতা বোধের জন্যই বায়ুরোগ হইয়া থাকে। ফলে আপনার হীনতাকে মানুষ সমাজের চক্ষু হইতে আড়াল করিতে চায়। এ্যাড়লার স্বয়ং এই প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন 'কিন্তু সমাজের চোখে তার এই হীনতা দূর করতে গিয়ে সে অনেক সময় বাড়াবাড়ি করে বসে। সে মনে মনে ভাবে সে মোটেও হীন নয়। বরং সমাজে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।[৯৪]' নীরদবাবুরও তাহাই হইয়াছে। তিনি বায়ুরোগে ভুগিয়া শুচিবায়ুগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। কথায় কথায় পৈতা বাহির করিয়াছেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কহিয়াছিলাম বিদেশে যাইয়া নীরদবাবুর বাঙালী পোশাক পরিবার দ্বিতীয় কারণটি কহিব। এক্ষণে তাহা কহিতেছি। বিদেশীর ভীড়ে কোট-প্যান্ট পরিধান করিয়া তিনি হারাইয়া যাইতে চাহেন নাই। তাই সকলের চক্ষে পড়িবার জন্য বায়ু-তাড়িত হইয়া বাঙালী পোশাক পরিধান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি স্বদেশে থাকিলে বিলাতী পোশাক পরেন ও বিদেশে থাকিলে

স্বদেশী পোশাক পরেন, তিনিই লেখক নীরদ চৌধুরী। এইরূপে নীরদবাবুর সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুত ব্যক্তি নীরদকে হীন মনে করিয়া লেখক নীরদচন্দ্র হীনমন্যতায় ভুগিয়াছেন।

পূর্বেই কহিয়াছি, পাঁচজনার চক্ষে পড়িবার জন্য নীরদ চৌধুরী তাঁহার ঘর-দোর শৌখিন জিনিষ-পত্র, আসবাব পত্র কিনিয়া আড়ম্বর করিয়া সাজাইয়াছিলেন। আসবাব পত্র দ্বারাই তিনি আপনার বিশিষ্টতা দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। আসবাবপত্রের প্রতি তাঁহার মোহ এতদূর হইয়াছিল যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের গৃহস্থালীর সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই। তিনি কহিয়াছেন 'তাঁহার গৃহস্থালীর ব্যবস্থাতেও আড়ম্বর ছিলনা, হয়ত বা জমিদারোচিত সৌষ্ঠব পর্যন্ত ছিলনা।[৯৫]' ব্যক্তি নীরদচন্দ্র মনে মনে রবীন্দ্রনাথের এহেন সাদাসিধা জীবন যাপনের পদ্ধতিকে শ্রদ্ধা করিলেও লেখক নীরদ চৌধুরীর লোক-দেখানো স্বভাব উহার সমালোচনা না করিয়া পারে নাই। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথেরই একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করি। তিনি কহিয়াছেন 'আমাদের বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। তখনকার জীবনযাত্রা ও তার আয়োজন এখনকার তুলনায় কতই অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সেজন্য আমাদের কারও মনে কিছুমাত্র সংকোচ ছিলনা। তার কারণ, তখনকার সংসারযাত্রার আদর্শে অত্যন্ত বেশি উঁচুনিচু ছিলনা। সকলেরই ঘরে একটা মোটামুটি রকমের চালচলন ছিল; তফাত যা ছিল তা বৈদগ্ধ্যের......তখন আমাদের আহার বিহার ও সকল প্রকার উপকরণ যা ছিল তা দেখলে এখনকার মধ্যবিত্ত লোকেদের মনেও অবজ্ঞা জাগতে পারত।[৯৬]' লেখক নীরদচন্দ্রের মনে সম্ভবত এই অবজ্ঞাই জাগিয়েছে। তবে তাঁহার দোষ নাই। ঠাকুর-বাড়ির ঐতিহ্য তিনি কোথায় পাইবেন ? তাই তাঁহাকে আসবাব-পত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে হইল। নীরদবাবুর ন্যায় ফুটানি-সর্বস্ব বাবুদের রবীন্দ্রনাথ ঠিকই চিনিয়াছিলেন। তাই তিনি কহিয়াছেন 'ধনগত বৈষম্যের বড়াই আমাদের দেশে এসেছে পশ্চিম মহাদেশ থেকে। এক সময়ে আমাদের দেশে যখন হাল আমলের অফিস-বিহারী ও ব্যবসাদারদের ঘরে নতুন টাকার আমদানি হল তখন তারা বিলিতি বাবুগিরির চলন শুরু করে দিলে। তখন থেকেই আসবাবের মাপেই ভদ্রতার পরিমাপ আরম্ভ হইয়াছে।[৯৭]' লেখক নীরদচন্দ্রও এই আসবাবপত্রের ফিতা দিয়া আপনাকে মাপিয়াছেন। সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল'তে যেমন ২৬

ইঞ্চি ছাড়া আর সব সংখ্যাই মুছিয়া গিয়াছিল, বুড়া যাহাই মাপিতেছিল— ঘাড়, বুক, কোমর সবই ২৬ ইঞ্চি হইতেছিল, সেইরূপ নীরদবাবুর এই মাপিবার ফিতাটির আর সব সংখ্যা মুছিয়া গিয়াছে ও একটিমাত্র সংখ্যা রহিয়া গিয়াছে, তাহা হইল 'চারশ বিশ'। এত বড় সংখ্যা দেখিয়া লেখক নীরদ চৌধুরী না জানি কি হইয়াছি ভাবিয়া নাচিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ব্যক্তি নীরদ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। বামুনের পৈতার ন্যায় লেখক নীরদচন্দ্র সকলকে ঐ ফিতা দেখাইয়া গর্ব করিতে লাগিলে পর ব্যক্তি নীরদের লজ্জার সীমা রহিল না। সেই সঙ্গে ভয়ও হইল, ঐ ফিতার দৌলতে তাঁহার 'চারশ বিশ' রূপটি তো ধরা পড়িবেই, উপরন্তু যেদিকেই মাপা হইবে গলা, হাত, কোমর, বুক—- সবই ঐ 'চারশ বিশ' ইঞ্চি হইবে। 'চারশ বিশ' ইঞ্চি কম কথা নহে, কিন্তু যত বড় সংখ্যাই হউক না কেন, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান হইয়া 'বরাহ' হইতে আর কাহারই বা ইচ্ছা করে? বিষ্ণু অবশ্য বরাহবতার হইয়া আসিয়াছিলেন দুষ্টকে বধ করিবার জন্য। সেইরূপে লেখক নীরদ কি বরাহবতার হইয়া ব্যক্তি নীরদকেই বধ করিতে চাহিয়াছেন ?

কতিপয় ব্রাহ্মণ সন্তান আছেন, যাঁহারা নীচুজাতের মানুষ দেখিলে ছোঁয়াছুঁয়িতে জাত যাইবার ভয়ে ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিয়া শত হস্ত দূরে গিয়া দাঁড়ান এবং আড়ালে চাঁড়াল নারী সংসর্গ করিতে কিন্তু তাঁহাদের বাধে না। নীরদবাবুও কতকটা তেমনই কাণ্ড করিয়াছেন। তাঁহার ধর্মপত্নীর জবানী হইতে উহা জানা যায়। ট্রেনের থার্ড ক্লাসে চাপিয়া তাঁহার স্ত্রী দিল্লীতে আসায় ব্যক্তি নীরদবাবু আগাইয়া আসিয়া পুত্র বাবলুকে কোলে লইয়াছিলেন। কিন্তু লেখক নীরদচন্দ্রের প্ররোচনায় কেহ দেখিবার পূর্বেই পুত্রকে লইয়া সরিয়া পড়েছিলেন থার্ডক্লাসযাত্রিণীর সংস্পর্শ লজ্জায় ত্যাগ করিয়া। সাহেবী পোশাকে সজ্জিত হইয়া ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের সামনে দাঁড়াইয়া লেখক নীরদ খুব সম্ভব আপনার পৈতাটি দেখাইতে চাহিয়াছিলেন; অথচ ঐ থার্ডক্লাসযাত্রিণী তাঁহার কেবল শয্যাসঙ্গিনী নন, জীবন-সঙ্গিনীও। অমিয়া চৌধুরাণীর ভাষায় 'গাড়ি থামার পর আমরা সবাই নেমে দাঁড়িয়েছি। এর মধ্যে দৌড়ে এসে আমার কোল থেকে ধাঁ করে বাবলুকে নিয়ে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমনি ভাব দেখাতে থাকলেন যেন আমাদের কাউকে চেনেনই না। আমার বুঝতে বাকি রইল

না। আমাদের আনতে গিয়েছেন একেবারে পুরো সাহেবটি সেজে, সেখানে স্ত্রী, ছেলেরা এসেছে থার্ড ক্লাসের যাত্রী হয়ে। আমরা হয়ে গেলুম তখন অস্পৃশ্য, হরিজন'।[৯৮]

বাস্তবিক, নীরদবাবুর পৈতা টানাটানির বহর দেখিয়া আমার ভয় করে সর্বসমক্ষে তাঁহার পৈতাটি না ছিঁড়িয়া যায়। লোকচক্ষুতে পড়িবার জন্যে নীরদবাবু কি না করিয়াছেন। শাশুড়ি চুল ছাঁটিতে বলিলে ন্যাড়া হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ঐরূপ মুণ্ডিত মস্তকে বিয়ে বাড়িতে লুচি পরিবেশন করিয়াছেন। নীরদবাবুর স্ত্রী মনে করিয়াছেন, ইহা শাশুড়িকে অপদস্থ করিবার জন্য নীরদবাবুর প্রচেষ্টা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। শাশুড়ির উপর তেজ দেখাইয়া নীরদচন্দ্র আরও অনেক কিছুই করিতে পারিতেন, যাহা আর কাহারও চক্ষে পড়িত না। কিন্তু তেজ দেখাইয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার এই সুযোগটুকু তিনি ছাড়িলেন না। সাজিয়া-গুজিয়া তিনি বিয়ে বাড়িতে ঘুরিয়া বেড়াইলে তাঁহার ক্ষীণদেহ কাহারও চক্ষে পড়িত না। কিন্তু ন্যাড়া মাথায় লুচি বহিয়া আনিয়া তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, এখানেও পৈতে দেখাইলেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এ পৈতা দেখাইলেন লেখক নীরদচন্দ্র। ব্যক্তি নীরদচন্দ্র কিন্তু স্ত্রী-ভীত বাঙালী স্বামীর ন্যায় স্ত্রীর চক্ষুর অগোচরেই ন্যাড়া হইবার কাজটি সমাধা করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী ব্যক্তি নীরদচন্দ্রকে চিনিতে ভুল করেন নাই; স্পষ্ট কহিয়াছেন 'পাছে আমি দেখতে পেলে বাধা দিই সেজন্য একেবারে আড়ালে এই কাণ্ড করেছেন'।[৯৯]

ব্যক্তি নীরদ আপনার কায়স্থ বংশ লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, লেখক নীরদ পৈতা তো পরিলেনই, উপরন্তু ন্যাড়া মাথা হইয়া বামুন-পণ্ডিতের টিকি রাখিলেন। অবশ্য বামুনের সত্ত্বভাব তাঁহার কিছুতেই আয়ত্ত হইল না। সেই রাগে টিকিতে প্রসাদী ফুল লাগাইয়া, বেতগাছাতে তুলসী পাতা বাঁধিয়া ব্যক্তি নীরদকে বেশ কয়েক ঘা মারিলেন। আত্মরক্ষা করিতে ব্যক্তি নীরদচন্দ্র তাঁহার স্ত্রীর আঁচলের তলায় আশ্রয় লইলেন। তাই যে নীরদচন্দ্র ব্রহ্মতেজে জ্বলিয়া উঠিয়া ঘোষণা করেন—'আমি সাম্রাজ্যবাদী, প্রথমত, মানুষ বলিয়া, কেঁচো নই বলিয়া,[১০০] সেই নীরদ অবশ্যই লেখক নীরদচন্দ্র। লিখিতে গিয়া সিংহ বিক্রমে যাহাকে-তাহাকে গালি দিতে তাঁহার বাধে না। শরৎচন্দ্রের লেখা সম্পর্কে তিনি অনায়াসে বলিয়াছেন

'ও-সব হিস্টিরিয়া-গ্রস্ত যুবতী ও বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনীদের কথা আমার ভাল লাগে না।'[১০১] এইরূপ অশ্লীল গালি দিয়াও নীরদবাবু লোকচক্ষে পড়িতে চাহিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষা বা রুচিতে বাধে নাই। আপনাকে পুরুষ সিংহ ভাবিয়া এবং কেঁচো নন ভাবিয়া তিনি গর্ব বোধ করিয়াছেন। যদিচ আমরা কখনও সিংহকে গালি দিতে শুনি নাই এবং কেঁচোকেও নম্রভাষী বলিয়া জানি না। যাহাই হউক, এই প্রসঙ্গে জানাইয়া রাখি- ব্যক্তি নীরদ চৌধুরী কিন্তু কেঁচো হইতে দ্বিধা করেন নাই। বিশেষত আপনার স্ত্রীর নিকট কেঁচোর ন্যায় গুটাইয়া থাকিতে তাঁহার বাধে নাই। একটি ঘটনার কথা কহি। একবার নীরদ চৌধুরী স্ত্রীর নিকট দুই টাকা চাহিয়া লইয়া বেজী কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার পত্নী তাঁহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্ত্রীকে লঙ্ঘন করিয়া ব্যক্তি নীরদ বাহির হইতে তো পারেনই নাই, উপরন্তু কেঁচোর মতো গুটাইয়া সুটাইয়া পুত্রের পাশে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। অমিয়াদেবীর ভাষায় 'যেই উনি শোবার ঘরের দরজা দিয়ে বের হতে যাবেন, আমি অমনি দৌড়ে ধড়াম করে দোরটা বন্ধ করে দিয়ে পিঠ দিয়ে ঠেলে দাঁড়ালাম। আমি আর নড়ি না, উনিও আর ঘর থেকে বের হতে পারেন না। কতক্ষণ কাকুতি-মিনতি করার পর আর কোনও উপায় না দেখে খাটে ছেলে ঘুমোচ্ছিলো তার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে রইলেন।'[১০২]

বস্তুত, ব্যক্তি নীরদের এহেন কেঁচোর মতো স্বভাব না হইলে কি লেখক নীরদের এত বাড় বাড়িত? কথায় কথায় তাঁহার পৈতা দেখাইবার বাই ব্যক্তি নীরদ এক টানে তাঁহার পৈতা ছিঁড়িয়া দিয়া ঘুঁচাইয়া দিত না?

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# চালুনি বলে—'ছুঁচ, তোর পিছনে কেন ছেঁদা'

আমোখা মানুষের দোষ খুঁজিয়া বেড়াইবার প্রবণতা নীরদবাবুর বাতিকে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। 'চোখে আঙুল দাদা'র ন্যায় অন্যের ত্রুটির প্রতি আঙুল দেখাইতে দেখাইতে লেখক নীরদ আপনার চক্ষেও আঙুল দিয়াছেন। ফলে আপনার দোষ ত্রুটিগুলি দেখিতে পান নাই। বাস্তবিক, সম্মুখে ফিরিয়া থাকিলে আপনার পিছনের ছিদ্র চক্ষে পড়ে না। কিন্তু লেখক নীরদ যতই সম্মুখে ঝুঁকিয়া অপরের ছিদ্রের প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন, ব্যক্তি নীরদ ততই আপনার ছিদ্রান্বেষী স্বভাব দেখিয়া লজ্জায় পিছনে মুখ লুকাইয়াছেন এবং তখনই আপনার পশ্চাদ্দেশের ছিদ্রটি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।

লেখক নীরদ চৌধুরীর এই যে অপরের খুঁত ধরিবার প্রবণতা, ইহাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় কহে 'Projection', ফ্রয়েডীয় তত্ত্বানুসরণে ডঃ সুনীলকুমার সরকার জানাইয়াছেন, এক্ষেত্রে 'অহং তার নিজের প্রবৃত্তিটি অন্য কারও মধ্যে খুঁজে বেড়ায়। এভাবে কোনও অসৎ লোক অপরের অসদতার প্রতি কড়া নজর দিতে পারে। নিজের মনের পঙ্কজনিত অপরাধবোধ সমগ্র বহির্জগতকে এই উপায়ে পঙ্কিল করে তোলে ও শুচিবায়ু দেখা যায়।"[১০৩] এক্ষেত্রে 'অহং' হইলেন লেখক নীরদ চৌধুরী এবং অপরাধবোধে ভুগিলেন ব্যক্তি নীরদ চৌধুরী। পরিণামে নীরদবাবু আরেকটি মনোরোগের শিকার হইলেন।

যেসব লেখকরা নর-নারীর দেহবাদের কথা লিখিয়াছেন, 'বাঙালী জীবনে রমণী' নামক গ্রন্থে নীরদবাবু তাঁহাদের 'লেখক বেশ্যা'"[১০৪] বলিতে দ্বিধা করেন নাই। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, লেখক বেশ্যাদের ব্যবসা চালাইবার অধিকারে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না, কিন্তু নীরদবাবুর ভাষাতেই কহি 'আমি প্রবল আপত্তি করিব যদি এইসব

কাহিনীর লেখকেরা নিজেদের উদ্দেশ্য সরল অন্তঃকরণে স্বীকার না করিয়া সমাজতত্ত্ব, দর্শন বা আর্টের ভড়ং চালান।"[১০৫] অথচ নীরদবাবু নিজেই তাহা করিয়াছেন। বাঙালী জীবনে একটি বিশেষ যুগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক লইয়া একটি গবেষণা মূলক বই করিবার ভড়ং করিয়া তিনি নর-নারীর ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণের অনেক অশ্লীল ইঙ্গিত দিয়াছেন, যাহার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আমি তাঁহার 'বাঙালী জীবনে রমণী' নামক বইটির কথা বলিতেছি। বইটির এক স্থানে তৎকালীন বাঙালী সমাজের পুরুষ-নারীর সম্পর্কে কামের কদর্যতা বুঝাইতে গিয়া লেখক একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনাটি হইল এই যে, একটি যুবক একটি কিশোরীর বক্ষে হাত দিয়াছিল। লেখক কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু নীরদবাবু এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। যুবকটির মুখের একটি অতি অশালীন উক্তি উদ্ধৃত করিলেন। যুবকটি নাকি উক্ত দোষে অভিযুক্ত হইয়া কহিয়াছিল 'আমাকে আপনারা ভুল বুঝবেন না। আমি নিজের বোন ভেবে শুধু বোঁটাতে একটু কুরকুরুণী দিয়েছিলাম।[১০৬]' ইহা লিখিয়াও নীরদবাবুর আশ মিটিল না, তিনি লিখিলেন যে, যুবকটির কথা শুনিয়া "ভদ্রলোকটি একেবারে বোমার মত ফাটিয়া গিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, 'শালা'! তুমি বোন ভেবে কুরকুরুণী দিয়েছিলে? কুরকুরুণী ঢুকিয়ে দেব তোমার পোঁদে।[১০৭]' এখানে এতখানি কি নীরদবাবুর না লিখিলেই চলিত না? সত্যই চলিত না। কেন চলিত না তাহা ব্যক্তি নীরদবাবু জানেন, কতকটা আমিও জানি। ব্যক্তি নীরদ আপনার এই বিকৃত কাম-লালসা মিটাইবার পন্থাটি জানেন বলিয়াই গ্রন্থটির ভূমিকাতেই কহিয়াছেন 'আমি বেনামীতে কামশাস্ত্র লিখিতে বসি নাই।[১০৮]' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাকড়সার রস' নামক গোয়েন্দা গল্পে এহেন একটি বৃদ্ধের দেখা মেলে। যৌবনে তিনি উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে পঙ্গুত্বের দরুণ বিছানায় শুইয়া আপনার তৃষিত কামনাকে অন্য কোনওভাবে মিটাইতে না পারিয়া, লিখিয়া মিটাইতেন। খাতা ভরিয়া নোংরা কথা লিখিতেন। নীরদবাবুরও আরও বহু নোংরা কথা এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রবৃত্তি হয় না। ইহা ব্যতীত জানাইয়া রাখি, পরবর্তী অধ্যায়ের বক্তব্যকে সপ্রমাণ করিবার জন্য ঐ সকল উক্তির কতকাংশ বাধ্য হইয়া আমাকে উদ্ধৃত করিতেই হইবে।

'আমি সাম্রাজ্যবাদী কেন' বলিতে গিয়া নীরদ চৌধুরী সদম্ভে জানাইয়াছেন 'ইংরেজের প্রসঙ্গে যাঁহারা সাম্রাজ্যবিরোধী হইয়াছেন, তাঁহাদের জামা

খুলিলে দেখা যাইবে, পিঠে লোহা পুড়াইয়া অক্‌স্‌ফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ, হারভার্ড ও অন্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাগা দেওয়া আছে। আমি এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নই, সুতরাং সাম্রাজ্যবিরোধী হইতে পারিলাম না।[১০৯]' উপরোক্ত উক্তিটি পড়িয়া মনে হয় আঙুরের নাগাল না পাইয়া শিয়াল কেবল 'আঙুর ফল টক' বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, যাহারা আঙুরের নাগাল পাইয়াছে হিংসায় জ্বলিয়া তাহাদের দূষিতে ছাড়ে নাই। বস্তুত, বিদেশী ডিগ্রীর প্রতি মোহ নীরদবাবুর কিছু কম ছিল না। আবার স্বদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থাও নীরদচন্দ্রর কিছু কম ছিল। তাই আপনার পুত্রদের দেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না করিয়া কলেজের পূর্বে অবধি তাহাদের গৃহেই পড়াইয়াছিলেন এবং আপনার মধ্যম পুত্রটিকে বহু অসুবিধার মধ্যেও উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে পাঠাইয়াছিলেন। ১৯৮৯ সালে অক্সফোর্ডের সাম্মানিক ডি. লিট লইতেও নীরদবাবু অস্বীকার করেন নাই। তবু তিনি আপনার একটি মেকী ভাবমূর্তি তৈরি করিয়া অপরের দোষ খুঁজিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু কোনও অসতর্ক মুহূর্তে ব্যক্তি নীরদচন্দ্র স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন যে, এই বিদেশে না পড়িয়া দেশে পড়িবার ব্যাপারটি তাঁহার ইচ্ছানুসারে ঘটে নাই, উহা নিতান্তই ভাগ্য চক্রের ব্যাপার। তাঁহার নিজের ভাষায় 'ইহা অদৃষ্টচক্রে ঘটিয়াছে, উহার উপরে আমার হাত নাই।'[১১০] হাত থাকিলে কি আর ছাড়িতেন ?

নীরদচন্দ্র বর্তমানকালের যুবকদের অর্থ গৃধ্নুতার নিন্দা করিয়া কহিয়াছেন—"....এ যুগের যুবকেরা যতই 'চুটিয়ে পীরিত' করুকনা কেন, পয়সার হিসাবে এমনই সেয়ানা হইয়াছে যে, প্রণয়িনীর কাঁধে টাকার তোড়া না দেখিলে 'লম্বা দিতে' পারে।"[১১১] অর্থ গৃধ্নুতাতে কিন্তু নীরদবাবুও স্বয়ং কিছু কম যান নাই। বিশেষত, আপনার বিবাহ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন—'বধূকে ক্ষণেকের জন্য দেখিয়া যত না আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহার চেয়ে অনেক আনন্দ বোধ করিলাম দানসামগ্রী দেখিয়া।[১১২] তাছাড়া তাঁহার শ্বশুর মহাশয় অপুত্রক ছিলেন। তাই নীরদবাবু জানিতেন 'তাঁহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি সমানভাবে চার মেয়ে পাইবে।"[১১৩] এ তথ্যও তাঁহার অজানা ছিল না যে, তাঁহার ভাবী পত্নীর জন্যও 'পাঁচ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া আছে।"[১১৪] তবু তিনি আপনার ছিদ্রকে ঢাকিবার চেষ্টা না করিয়া অপরের ছিদ্র খুঁজিতে আগ্রহী হইলেন। আপনার অর্থলোলুপ সত্তাটিকে চিনিয়া ব্যক্তি নীরদ চৌধুরী লজ্জায় মরিয়া গেলেন এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আজীবন স্ত্রৈণ হইয়া রহিলেন।

আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চারুচন্দ্র চৌধুরীকে দোষারোপ করিতেও নীরদবাবু ছাড়েন নাই। চারুবাবুর ন্যায় বিদ্বান, স্বল্পে সন্তুষ্ট ব্যক্তিকে তিনি 'আত্মপরায়ণ'[১১৫] বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। অথচ সত্যকারের 'আত্মপরায়ণ' লেখক নীরদচন্দ্রই বটেন! ভণ্ড সন্ন্যাসীর ন্যায় ঈশ্বরকে সম্মুখে খাড়া করিয়া 'আত্মপরায়ণ' নীরদ চৌধুরী আপনি গা ঢাকা দিতে চাহিয়াছেন। আপনার যশ-লালসাকে গোপন করিবার জন্য তিনি ঈশ্বরের দোহাই টানিয়া বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি একটা বিশিষ্ট শক্তি লইয়া জন্মিয়াছেন তাঁহার প্রধান কর্তব্য সেই শক্তির চর্চা করিয়া উহাকে পূর্ণ বিকশিত করা। যে-ই বা যাহাই তাঁহাকে এই শক্তি দিয়া থাকুক—তিনি নিজে উহা সৃষ্টি করেন নাই—সেই দাতার কাছে তিনি ঋণী।'[১১৬] উক্ত দাতাটিই হইলেন নীরদবাবুর মতে দেশ বা ঈশ্বর। যাঁহাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া জেরা করিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই, তাঁহার দোহাই পাড়াই নীরদবাবু নিরাপদ মনে করিয়াছেন। অন্যদিকে, অগ্রজের আত্মভোলা অন্তর্মুখী প্রকৃতিকে ঠেস দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাঁহার প্রচার-বিমুখতাকে ঈর্ষায় তিনি 'আত্মপরায়ণতা' আখ্যা দিয়াছেন। ঈর্ষা, কেন না প্রচার-বিমুখ হইয়া জ্ঞানে ডুবিয়া থাকা, স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকার ক্ষমতা তাঁহার আয়ত্তাতীত। আপনার এই অক্ষমতার কথা জানিয়া আপনাকে মহামানবরূপে দেখাইবার ইচ্ছা তাঁহার প্রকট হইল। দার্শনিকের ভেক লইয়া আপনাকে বিশ্বাত্মার অংশ বলিতেও তাঁহার বাধিল না। বলিলেন 'বিশ্ব বৈদ্যুতিক শক্তি, অনন্ত, অফুরন্ত, অসীম, নিরাকার। ....আমি সেই শক্তির একটি ক্ষুদ্রভাগ।[১১৭]' এইরূপে লেখক নীরদ বৈষ্ণব-দর্শনের সূত্র কপচাইলেন। কৃষ্ণ যদি সমুদ্র হয়, মানুষ তার জলকণা—এই কথাটিকেই একটু অন্যরকম করিয়া কহিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি মানুষের যে প্রেম, বিশ্বের প্রতি নীরদবাবুর সেই প্রেম কোথায়? তবু তিনি বিশ্বাত্মার সহিত একাত্মতা অনুভব করিবার কথা বলিলেন। আসলে তাঁহার ভেদবুদ্ধি অতি প্রবল। কিন্তু তাহা কেবল আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিবার সময়। তাই অন্যত্র কহিয়াছেন—'নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হওয়ার ফলে আমি সাধারণ বুদ্ধির লোকের সঙ্গে মিশিতে পরিতাম না।'[১১৮] অথচ অসীম বিশ্বের সহিত আপনাকে মিশাইতে তাঁহার অসুবিধা হইল না। ইহা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দু-চারটি পংক্তি মনে আসে—

'কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
ভাই বলে ডাকো যদি, দেব গলা টিপে
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা
কেরোসিন বলি উঠে-'এসো মোর দাদা।'

নীরদবাবুর অবস্থা এই কেরোসিন শিখার মতোই। নীরদবাবু সত্যই এতটা বাড়াবাড়ি না করিলেও পারিতেন। রাজশেখর বসুর 'স্মৃতিকথা'য় কথিত সাবধান বাণী ব্যক্তি নীরদচন্দ্র অবশ্যই লেখক নীরদ চৌধুরীকে শুনাইয়াছিলেন। কিন্তু ভেদবুদ্ধি প্রবল হওয়ায় লেখক নীরদচন্দ্র আপনার মধ্যেও ভেদ করিলেন—সাধারণ বুদ্ধির মানুষ ব্যক্তি নীরদচন্দ্রের কথায় কান দিলেন না। নতুবা, পরশুরামের 'স্মৃতিকথা'র কথোপকথন অনুসরণ করিয়া বলা যাইতে পারে, লেখক নীরদ যখন গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হইয়া জানাইয়াছিলেন 'একটা স্মৃতিকথা লিখছি।' তখন ব্যক্তি নীরদ চৌধুরী তাঁহাকে উৎসাহ দিলেও সাবধান করিতে ভোলেন নাই। তিনি কহিয়াছিলেন—'বেশ, বেশ। গল্পের চাইতে ঢের ভাল। কিন্তু বেশী মিছে কথা লিখোনা, যা রয়-সয় তাই লিখবে। কলেরা থেকে উঠেই ফুটবল ম্যাচ খেলেছ, দেশের জন্য দশ বছর জেল খেটেছ, তিনটি মেয়ে তোমাকে প্রেমপত্র লিখেছিল, রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে তোমার পিঠ চাপড়েছিলেন, এ সব লিখতে যেয়োনা।'[১১৯] কিন্তু লেখক নীরদ চন্দ্র অপরের ছিদ্র খুঁজিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, আপনাকে নিশ্ছিদ্র দেখাইবার জন্য অত্যুক্তি করিলেন। লেখক নীরদের এই ভুলের মাশুল দিতে হইল ব্যক্তি নীরদচন্দ্রকে। লোকের গালি আর সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি কানে আঙুল দিয়া বলিলেন 'আমারও বলিতে ইচ্ছা হয় কাটিতে চাও কাটিয়া ফেল, ছাড়িয়া দিতে চাও ছাড়িয়া দাও, কেবল এই পালা সাঙ্গ কর।'[১২০] মনে রাখিতে হইবে, এই উক্তি তাঁহার গালিপ্রদানকারী জনগণের প্রতি নহে, যাঁহার জন্য তাঁহাকে গালি খাইতে হইতেছে, নিত্য যাঁহার সহিত টানাপোড়েনে তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে, এই উক্তি সেই লেখক নীরদ চৌধুরীর প্রতি। কিন্তু 'কা কস্য পরিবেদন।" লেখক নীরদচন্দ্র বগল বাজাইয়া গাহিলেন 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না।'

'বাঙালী জীবনে রমণী' গ্রন্থের ভূমিকায় নীরদ চৌধুরী কলিকাতার বিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতি যে কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে কতদূর সত্য বলিতে পারি না, তবে নীরদবাবু সম্পর্কে তাহা প্রায় সর্বাংশে সত্য। নীরদচন্দ্র কহিয়াছেন 'ইঁহারা কার্যকলাপে বিত্তবান জীবন যাপন করেন মোটা বা দোহারা মাহিনা পান, ভাল বাড়িতে থাকেন, ভাল গাড়ীতে চড়েন, ভাল খান, দুঃখ-কষ্টের সহিত কোনও সংস্রব রাখেন না, মা বা ভাইবোনের দারিদ্র্যের সঙ্গেও নয়; আর কথা-বার্তায় ইঁহারা ধার করা পাকামো দেখাইয়া পাশ্চাত্ত্য বুক্‌নী আওড়ান এবং 'ইন্টেলেক্‌চুয়্যাল'-

দের শুকবৃত্তি করেন। ইঁহারা আমাদের সেই প্রাণহীণ, জড়তাপ্রাপ্ত পুরাতন নৈয়ায়িক বা স্মার্ত নূতন চেহারায়। আবার এই বাস্তববাদীরা সামান্য একটু অভাবের সম্ভাবনা দেখিলে, চাকুরি যাইবার আশঙ্কা হইলে কত কেঁউ কেঁউ করিয়া হাত কচলাইতে পারেন, তাহার খবরও আমি কিছু কিছু রাখি।"[১২১] কেবল ইহা বলিয়াই নীরদবাবু নিরস্ত হন নাই, বলিয়াছেন— 'তাঁহাদের বাস্তবের সহিত আমার কোনও কারবার নাই।'[১২২] আপনার বাস্তব নীরদবাবুর অজানা নহে। তাই এই আস্ফালন। তাছাড়া, কলিকাতার বিজ্ঞ সমাজের মধ্যে সত্যই কিছু 'ইন্টালেক্চুয়্যালের' সন্ধান মিলে, তাঁহাদের প্রতি ঈর্ষাবশত নীরদবাবু বিদ্রূপ শাণাইয়াছেন। প্রসঙ্গত, যথারীতি আপনাকে চরিত্রধর্মে তাঁহাদের উর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া একটি গল্প মনে পড়ে। উহা 'সাতমারী পালোয়ানে'র গল্প। একটি লোক এক চড়ে সাতটি মশা মারিয়া খুব চীৎকার করিয়া বীরত্ব দেখাইয়া কহিয়াছিল 'এক চড়ে সাত মেরেছি. এক চড়ে সাত মেরেছি।' তাহার হুঙ্কার শুনিয়া লোকে ভাবিয়াছিল না জানি ইনি কত বড় বীর! এক চড়ে সাতটি মানুষ, সাতটি বাঘ, নাকি সাতটি হাতিই মারিয়া বসিয়াছেন। তেমনি নীরদবাবুও খুব আপনার সম্পর্কে ঢাক-ঢোল পিটাইয়া কহিলেন 'এক চড়ে সাত মেরেছি।' লোকেও ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া ভাবিল-না জানি ইনি কত বড় মানুষ! কি ভীষণ চরিত্রবল এনার! কিন্তু স্বয়ং ব্যক্তি নীরদ তো জানেন, এক চড়ে তিনি সাতটি মশাই মারিয়াছেন। পাছে এ সত্য কেহ টের পায়, তাহার ভয়েই তাঁহার এই হুঙ্কার।

যাহা হউক, এক্ষণে আসুন দেখি—নীরদবাবু কলিকাতার বিজ্ঞ পণ্ডিতদের গুণগুলি ছাড়াও দোষগুলি কতদূর আয়ত্ত করিয়াছেন। প্রথমেই আমরা দেখি নীরদবাবু প্রথম জীবনে নিরুপায় হইয়া দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করিলেও পরবর্তীকালে শৌখিন, বিত্তবান জীবনই যাপন করিয়াছেন। আসলে প্রথম জীবনে তাঁহার ব্যক্তিরূপই প্রধান ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে লেখকরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেই ঘরে দামী আসবাব পত্র, বিলাতী সুরার অভাব হয় নাই। আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও লেখক হিসেবে যশ পাইবার লোভে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গিয়া বাস করিতে তাঁহার ন্যায় সুবিধা-পরায়ণ ব্যক্তির বিবেকে বাধে নাই। বিলাতে বড় বাড়ি করিয়াছেন, শৌখিন ফুলের চাষ করিয়াছেন অর্থ ব্যয় করিয়া। কিন্তু আপনার দরিদ্র আত্মীয়ের সহিত সংস্রব রাখিবার কোনরূপ প্রচেষ্টা করেন নাই। নীরদবাবু এতদূর স্বার্থপর যে, আপনার ভ্রাতার মৃত্যুর পর অসহায়া বিধবা ভ্রাতৃবধূ

ও তাহার দুগ্ধপোষ্য সন্তানদের আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। অর্থাভাবের অজুহাতে কয়েক মাস পরেই তাহাদের তিনি বিদায় দিয়াছেন। অথচ তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল। এ প্রসঙ্গে পূর্বেই আমি সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। তাই এখন সংক্ষেপে সারিলাম। নীরদবাবুর স্বার্থপরতার আরও উদাহরণ মেলে। নীরদবাবুর স্ত্রী অমিয়াদেবী তাঁহার 'প্রবাসিনী দিদিমা' গ্রন্থে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার দুই ননদেরই চরম দুর্গতি হইয়াছিল। অমিয়া চৌধুরাণীর ভাষায় 'একসময়ে যাঁরা বলতে গেলে টাকার ওপর দিয়ে হেঁটেছেন, বড় জমীদারী, গোলা বোঝাই ধান, চাল,—কালের গতিকে কপর্দকশূন্য হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়ে অকালমৃত্যুতে পা দিলেন।'[১২৩] বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গে তাঁহাদের নীরদবাবু আশ্রয় দেন নাই। দিলে হয়তো অকালমৃত্যু তাঁহাদের গ্রাস করিত না। এমনকি, পরান্নে জীবনধারণ করিবার সময়ও নীরদবাবুর এই আত্মপরায়ণতা যায় নাই। এক ভ্রাতার দিন মজুরি লইয়া তিনি তাঁহার সংসার চালাইয়াছেন এবং অন্য ভ্রাতা তাঁহার আশ্রয় চাহিলে ফিরাইয়া দিতে ইতস্তত করেন নাই। এই প্রসঙ্গও পূর্বে ব্যাখ্যান করিয়াছি। আরও জানাই, বাড়িতে জায়গা কম এই অজুহাতে গৃহে আশ্রিতজনকে হস্টেলে পাঠাইতেও তিনি দ্বিধা করেন নাই। অমিয়াদেবী কহিয়াছেন— 'বাড়িতে এতজনের জায়গা কম বলে সমর কলেজের হস্টেলে চলে গেল।'[১২৪] অবশ্য কলিকাতায় থাকাকালীন নীরদবাবু তাঁহার টলু-বিলু নামক দুই ভাইকে জেল হইতে ছাড়া পাইবার পর কিছুদিন আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং আত্মীয় সমাগমও স্থায়ীরূপে না হইলেও ঘটিত তাঁহার গৃহে। তবে তাহার কারণ ব্যক্তি নীরদ চৌধুরী। লেখক নীরদের সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে তখনও কিছু বাকি ছিল। যখন সম্পূর্ণ হইলেন, তখন আত্মীয়-স্বজন, দেশবাসীকে স্বার্থের প্রয়োজনে ত্যাগ করিয়া বিদেশে আসিলেন। বস্তুত, এই লেখক নীরদ যখনই ব্যক্তি নীরদের মধ্যে উঁকি মারিয়াছেন, তখনই নীরদবাবু স্বার্থপর হইয়াছেন। তাঁহার ভিতরকার এই দ্বন্দ্ব ভারতে বাস করা অবধি খুবই প্রবল ছিল। কিন্তু ক্রমশ দ্বন্দ্বে লেখক নীরদ জিতিতে লাগিলেন এবং শেষকালে বিলাতে আসিয়া ব্যক্তি নীরদ হার স্বীকার করিলেন।

কলিকাতার 'ইন্টালেক্‌চুয়্যাল'-দের ন্যায় নীরদ চৌধুরী অবশ্য চাকুরী যাইবার আশঙ্কায় হাত কচলান নাই। তবে চাকুরী পাইবার জন্য কচলাইয়াছেন। তিনি স্বয়ং এ সম্পর্কে তাঁহার 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি'

শীর্ষক গ্রন্থে কহিয়াছেন যে, পিস্‌তুতো দাদাকে ধরিয়া তাঁহার চাকুরী হইয়াছিল। এছাড়া ধার করিবার জন্যও নীরদবাবু হাত কচলাইয়াছেন। এক্ষণে নীরদবাবুর ভাষাতেই ইহার বিবরণ দিতেছি—'বিপন্ন হইয়া এক অত্যন্ত ধনী নিকট আত্মীয়ের কাছে টাকাটা ধার চাহিলাম। তিনি প্রথমে রাজি হইলেন না। অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করাতে শেষে দিলেন।'[১২৫] চাকুরি হারাইবার ভয়ে 'কেঁউ কেঁউ' করা অপেক্ষা ইহা কিছুমাত্র গৌরবের বলিয়া আমার মনে হয় না। লেখক নীরদচন্দ্র ইংরাজী প্রবাদটি ভুলিয়া গেলেন। আপনি কাচের ঘরে বাস করিয়া অপরের গৃহে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেন। উল্টা ঢিল খাইয়া যখন আপনার ঘর ভাঙিল তখন ভারি অভিমান করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন 'আমার ভাগ্যে সাধারণত নিন্দাই জোটে।'[১২৬]

অপরের ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়াইবার মধ্যেও কিন্তু নীরদ চৌধুরীর বিশিষ্টতা আছে। পাঠকবর্গ, আপনারা লক্ষ্য করিলে দেখিবেন নীরদবাবু ব্যক্তিগত নয়, জাতিগত নিন্দায় বিশ্বাসী। তাই বাঙালীকে গাল দিয়াছেন, পণ্ডিতকে গাল দিয়াছেন, অধ্যাপককে গাল দিয়াছেন, প্রবাসী বাঙালীদের—বিশেষত যাঁহারা উচ্চশিক্ষার্থে বিলাতে ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও প্রাণ ভরিয়া গালি দিয়াছেন। ইহাতে সঙ্কীর্ণতা যেমন ঘুচিয়াছে, ব্যক্তিবিশেষের বিরাগভাজন হইবারও কারণ থাকে নাই। অবশ্য নীরদবাবু ব্যক্তি বিশেষের নিন্দাও কখনও কখনও করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখি তাহা করিয়াছেন উক্ত ব্যক্তির মত্যুর পর। মৃত ব্যক্তিকে গালি দেওয়া অপেক্ষা আর নিরাপদ কি হইতে পারে ?

নীরদবাবু 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ' লিখিলেন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বহু পরে। অবশ্য উক্ত গ্রন্থটিতে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গালি দেন নাই, তবে তাঁহার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলিয়াছেন, যাহা রবীন্দ্রনাথ পড়িলে খুব তুষ্ট হইতেন এমত বলা চলে না। এতদ্ব্যতীত, নীরদবাবু সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পরই ঘোষণা করিলেন যে, কলিকাতায় বাস না করিলে সত্যজিৎবাবু 'অস্কার পাওয়া দূরে থাকুক, ফিল্‌মও তৈরি করিতে পারিতেন না।.'[১২৭] জওহরলাল নেহেরুর আত্মজীবনীটি যে তাঁহার আত্মজীবনীটি অপেক্ষা ন্যূন, তাহাও জওহরলালের মৃত্যুর পরই দৃপ্ত কণ্ঠে বলিলেন—"The Autobiography of an unknown Indian" এই বইটির জন্যই আমি ইংরেজীতে লেখক বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হই। উহা প্রকাশের পরই বিলাতে যেভাবে প্রশংসিত হইয়াছিল ও যেভাবে আলোচিত হইয়াছিল

তাহা ইহার পূর্বে কোনও ভারতীয়ের লেখা ইংরেজী বই-এর বেলাতে দেখা যায় নাই, এমনকি জবাহরলাল নেহেরুর আত্মজীবনীর জন্যও নয়।"[১২৮] কেবল ইহাই নহে, তিনি নেহেরুকে ভারতবাসীর 'পূর্বতন শত্রু ও নবলব্ধ বন্ধু'[১২৯] বলিতেও ছাড়েন নাই। অবশ্য ব্যক্তিগত আক্রোশেই ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাও ১৯৯৪ সনে, নেহেরুর মৃত্যুর বহু পরে। জীবিত ব্যক্তি সম্বন্ধে নীরদ চৌধুরী কখনও নিন্দা করেন নাই, একথা বলিলে অবশ্য মিথ্যা বলা হইবে। আমি তাহা বলিব না। করিয়াছেন, তবে আড়ালে। শরৎচন্দ্রের লেখা সম্পর্কে তিনি তাঁহার দাদার শ্বশুর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—'ওসব হিস্টিরিয়া গ্রস্ত যুবতী ও বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনীদের কথা আমার ভাল লাগে না।"[১৩০] কেবল ইহাই নহে, নীরদবাবু ১৩৯৫ সনে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর লিখিলেন—-'যেসব বাঙালী কিছু পড়াশোনা করিয়াছে, তিনি তাহাদেরই মতো পাণ্ডিত্যাভিমানী, অথচ পাণ্ডিত্য এমন কিছু নয়।"[১৩১] নীরদবাবু শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ত্রুটি ধরিতে ও প্রবন্ধের নিন্দা করিতে কসুর করিলেন না। এমনকি তাঁহার চরিত্রের প্রতিও নিতান্ত নীচ ব্যক্তির ন্যায় কটাক্ষ করিয়া বলিলেন যে, শরৎচন্দ্রের বাড়িতে একটি মেয়েকে দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, শরৎবাবুর 'উপপত্নীর সন্তান।"[১৩২] কিন্তু শরৎচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকালে নীরদবাবু তাঁহার উপরোক্ত বক্তব্যগুলির কোনটিরই ভুলক্রমে উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার এইরূপ নিন্দা প্রবৃত্তি দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকেরহস্যে'র একটু অংশ স্মরণে আসে। এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

'প্রথম বানর। এই বাঘেরা আমাদিগের চিরশত্রু। আইস, কিছু নিন্দা করিয়া শত্রুতা সাধা যাউক।

দ্বিতীয় বানর। অবশ্য কর্তব্য, কাজটা আমাদিগের জাতির উচিত বটে।

প্রথম বানর। আচ্ছা, তবে দেখ, বাঘেরা কেহ নিকটে নাই ত ?"[১৩৩]

## সপ্তম অধ্যায়

# পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ

পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ লইয়া নীরদবাবু সারা জীবন কাটাইলেন। ব্যক্তি নীরদ যত পেট থাবড়াইয়া বলিলেন—'আমার ক্ষিদে পেয়েছে। আমি খাব।' লেখক নীরদ ততই তাহাকে টিপিয়া বলিলেন 'চুপ কর ভায়া। সভ্য ভদ্র সমাজে থাকিতে হইলে অত 'ক্ষিদে ক্ষিদে' করিয়া চেঁচাইতে হয় না। ইহা অত্যন্ত লজ্জাকর।' ব্যক্তি নীরদচন্দ্র আর কি করেন! থতমত খাইয়া চুপ করিলেন। বিবেকানন্দ তাঁহার 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে ইউরোপীয়দের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাহারা 'লোকলজ্জার ভয়ে খেয়ে দেয়ে মুখটি মুছে বসে থাকে;—ক্রমে দাঁতের সর্বনাশ হয়।'[১৩৪] এক্ষেত্রেও লোকলজ্জার ভয়ে লেখক নীরদ আপনার যৌবনের ক্ষুধা গোপন করিলেন, ইহাতে ক্রমে সর্বনাশ হইল। ব্যক্তি নীরদ 'কামচোরে' পরিণত হইলেন।

একখানি প্রচলিত সহজ গল্প বলিলে আশা করি পাঠকদের বুঝিতে সুবিধা হইবে। বোকা জামাইয়ের গল্প আমাদের প্রায় সকলেরই জানা। জামাই বোকা বলিয়া তাহার মা বলিয়াছিল শ্বশুরবাড়ি যাইয়া লজ্জা করিয়া খাইতে। তাহাতে সেই জামাই প্রচুর ক্ষুধা ও প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও একেবারেই খাইল না, এবং গভীর রজনীতে ক্ষুধার জ্বালা আর সহিতে না পারিয়া শ্বশুরবাড়ির রান্নাঘরে চুরি করিয়া খাইতে ঢুকিল এবং ধরা পড়িল। ঐরূপে ব্যক্তি নীরদ, লেখক নীরদচন্দ্রের প্ররোচনায় প্রথমে ক্ষুধা থাকিলেও কিছুই মুখে তুলিলেন না, পরে লজ্জার মাথা খাইয়া চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িলেন। কিভাবে, তাহা এক্ষণে আলোচনার দ্বারা প্রমাণ করিব।

যৌবনের প্রাক্কালেই লেখক নীরদের আত্মশাসনের ঠ্যালায় ব্যক্তি নীরদ

অস্থির হইয়াছিলেন, 'সংযম' বলিয়া তিনি যাহা শুরু করিয়াছিলেন, তাহাকে সাদা বাংলায় 'অত্যাচার' বলা যায়। নীরদ খালি পায়ে থাকিতেন, চুল আঁচড়াইতেন না। পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না ; এমনকি তাঁহার ভাষায় 'মনে করিলাম, চেয়ারে বসিয়া পড়া পৌরুষের অভাবের লক্ষণ, সুতরাং টেবিলের উপর একটা ডেস্ক বানাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম।'[১৩৫] কেবল ইহাই নহে, খাটে তোষক পাতিয়া শোয়াকে দুর্বল চরিত্রতা মনে করিয়া তিনি শক্ত মেঝেতে মাদুর পাতিয়া ঘুমাইতেন। আশা করি পাঠকরাও আমার সহিত একমত হইবেন যে, নীরদবাবুর এহেন আত্মসংযম নিতান্তই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে। অবশ্য তাঁহার এইরূপ বাড়াবাড়ি করিবার কারণ ছিল। লোকচক্ষুতে আপনাকে মহান দেখাইতে কাহার না সাধ হয়? তদুপরি আপনার অসাধারণ কাম প্রবৃত্তিকে শাসন করিবার জন্য এইরূপ কড়াকড়ি নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

অসাধারণ কামপ্রবৃত্তি বলিতেছি এই জন্য যে, মাত্র ১৩-১৪ বৎসর বয়সেই স্বামী স্ত্রীরূপে নর-নারীর মিলন সম্পর্কে নীরদচন্দ্র যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। বাঙালীর ঘরে ঐ বয়সে ঐরূপ কাম-সচেতনতার দৃষ্টান্ত বিরল। কেন না ঐ বয়সেই 'রামের সুমতি'র রামের দুষ্টামি ও ছেলেমানুষীর অন্ত নাই। 'পথের পাঁচালী'র অপু তো ঐ বয়সে নিতান্ত বালক। কিন্তু ঐ বয়সে আপনার চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে জানাইতে গিয়া নীরদবাবু লিখিয়াছেন—'স্বভাবে ডেঁপো বা জ্যাঠা হওয়াতে ১৩-১৪ বৎসর বয়স হইতেই জীবনের নানা অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিতাম। নানা অবস্থার মধ্যে স্বামী স্ত্রীর দৈহিক আকার ও শক্তির অনুপাত কি হওয়া উচিত তাহাও স্থির করিয়া রাখিলাম। সিদ্ধান্ত করিলাম অনুপাত এরূপ হওয়া উচিত যে স্বামী অবলীলাক্রমে স্ত্রীকে কোলে করিয়া বেড়াইতে পারে।'[১৩৬]

লেখক নীরদ আগুনকে ছাই চাপা দিতে গিয়াছিলেন। পরিণামে আগুনের শিখা তাঁহাকে গ্রাস করিল। মিথ্যা সংযমের ভড়ং খসিয়া পড়িয়া বিলাসী নীরদচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ করিতে বিলম্ব হইল না। পোশাকে-আশাকে, আসবাবপত্রের বাহারে, বিলাতি সুরার উপাচারে নীরদচন্দ্র ক্রমে সকলকে ছাড়াইয়া গেলেন। বেশ-ভূষায় 'বাবু' হইবার চেষ্টা করিলেন। দুই জোড়া চশমা বানাইলেন। একটি সূক্ষ্ম রিমলেস প্যান্টোলেন্সওয়ালা

প্যাঁসনে-তাহা রেশমের ফিতায় ঝুলিয়া তাঁহার সিল্কের পাঞ্জাবিকে অলঙ্কৃত করিত; অন্যটি কচ্ছপের খোলার। তাহার ফ্রেম হইতে নানা বর্ণের আলোক বিচ্ছুরিত হইত। কেশবিন্যাসেও বাবুর কিছু পারিপাট্য হইল। মধ্যে সিঁথি কাটা বাবরি চুল রাখিলেন। জুলপি নামিল কানের নীচে। ইহা ছাড়াও ইয়ার্ডলির ল্যাভেন্ডার সাবান ব্যতীত বাবুর মন উঠিল না। বলা বাহুল্য ইনিই বঙ্কিমচন্দ্র বিবৃত বৈশম্পায়ন কথিত সেই বাবু, 'সেই চস্মাঅলঙ্কৃত,....রঞ্জিত কুন্তল,.....পরভাষা-পারদর্শী, মাতৃভাষা বিরোধী.......যাঁহাদিগের চরণ মাংসাস্থিবিহীন শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইলেও পলায়নে সক্ষম, —হস্ত দুর্বল হইলেও লেখনীধারণে....সুপটু....যিনি আপনাকে অনন্ত জ্ঞানী বিবেচনা করিবেন,......যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণীতে'....সেই 'বাবু'।"[১৩৭]

'চস্মা অলঙ্কৃত' এবং 'কুন্তল-বিলাসী' কেন, তাহা আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। এইবারে কহিব কেন তাঁহাকে 'পরভাষাপারদর্শী' ও 'মাতৃভাষাবিরোধী' কহিলাম। প্রথমত, নীরদবাবু ইংরাজীর তুলনায় বাংলায় অনেক কম লিখিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, নীরদবাবু বলিয়াছেন—-'সামাজিক আচরণেও ইংরাজী ব্যবহার না করিলে সম্মানের লাঘব হইত। পত্র ব্যবহার ইংরেজী জানা বাঙালীর মধ্যে ইংরেজী ছাড়া বাংলায় হইত না—-বিশেষ করিয়া পিতা-পুত্রের মধ্যে।......আমিও আমার তিন পুত্রের কাছে চিঠি লেখায় সেই প্রথার নিগড় ভাঙিতে পারি নাই, ইংরেজীতেই চিঠি লিখি।"[১৩৮] এই প্রথার নিগড় যিনি ভাঙিতে পারিলেন না, তিনি লেখক নীরদ, সামাজিক মর্যাদাতে ইংরেজী জানা বাবু হইয়া 'ইন্টালেকচুয়্যাল' আখ্যা পাওয়া যাঁহার স্বপ্ন। আর যিনি এই নিগড় ভাঙিতে না পারার জন্য দুঃখিত হইয়াছেন, তিনি ব্যক্তি নীরদ। এই ক্ষেত্রেও নীরদবাবু তাঁহার 'পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ' নীতিটি বজায় রাখিয়াছেন। বাংলা ভাষার প্রতি— মাতৃভাষার প্রতি ব্যক্তি নীরদের ক্ষুধাকে লোকলজ্জার ভয়ে লেখক নীরদ চাপা দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার এই ক্ষুধার কথা লোকলজ্জার ভয়ে গোপন করেন নাই। সভায় তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া জনগণের বিদ্রূপ-ভাজন হইয়াছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং কহিয়াছেন 'বাঙালীর ছেলের পক্ষে যে গালি সবচেয়ে লজ্জার সেইটাই সেদিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল,

অর্থাৎ ইংরেজি আমি জানিনে।'[১৩৯] রবীন্দ্রনাথ আরও কহিয়াছেন 'এত বড়ো দুঃসহ লাঞ্ছনা আমি নীরবে সহ্য করেছিলুম তার একটা কারণ, ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় বাল্যকাল থেকে আমি সত্যিই অবহেলা করেছি; দ্বিতীয় কারণ, পিতৃদেবের শাসনে তখনকার দিনেও আমাদের পরিবারে পরস্পর পত্র লেখা প্রভৃতি ব্যাপারে ইংরেজি ভাষা অপমানজনক বলিয়া গণ্য হত।'[১৪০] রবীন্দ্রনাথের কাছে যাহা 'অপমানজনক' তাহাকেই 'সম্মানজনক' বলিয়া লেখক নীরদ চৌধুরী গ্রহণ করিলেন।

আর নীরদ চৌধুরীর চরণ যে পলায়নে সক্ষম, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহার বিদেশ গমন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে কৈফিয়ত দিতে গিয়া নীরদবাবু জানাইয়াছেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় বিদেশে যান নাই; নানাবিধ যোগাযোগের ফলে উহা পাকেচক্রে ঘটিয়াছে। দশচক্রে ভগবানও ভূত হইয়া থাকেন বলিয়া যেখানে প্রবাদ আছে, সেখানে পাকেচক্রে নীরদ চৌধুরী তো পলাতক হইতেই পারেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন স্বদেশের প্রতি টান থাকিলে, ইচ্ছা করিলে কি তিনি ফিরিতে পারিতেন না? আসলে পালাইবার ইচ্ছা তাঁহার মনে বহুকাল যাবৎই ছিল। কেবল যোগাযোগের, সাহসের ও উদ্যমের অভাবে উহা হইয়া উঠে নাই। এ প্রসঙ্গ উঠিলে পর নীরদবাবু স্বয়ং বলিয়াছেন 'এখানে ভাল মাইনের চাকুরিতে আছি। ছেলেদের শিক্ষা বলতে গেলে আরম্ভও হয়নি। এই অবস্থায় নিশ্চয়তা ছেড়ে অনিশ্চয়ের পিছনে যাওয়া কি উচিত হবে?'[১৪১] ইহা নিতান্তই সাহসের অভাবজনিত সংশয়, অনিচ্ছা নহে। বরং নীরদবাবু বারবার কহিয়াছেন—'কলিকাতায় বা দিল্লীতে থাকিলে আমার বড় কাজ সম্পূর্ণ হইত না।'[১৪২] সুতরাং যোগাযোগ যখন হইল তখন আর অপেক্ষা কিসের? নীরদচন্দ্র চম্পট দিলেন। বিদেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, খ্যাতি ও নানান সুবিধা ছাড়িয়া স্বদেশে ফিরিতে লেখক নীরদ চৌধুরীর ইচ্ছা করিল না। ফলে মাতৃভূমির জন্য ব্যক্তি নীরদ চৌধুরীর তৃষ্ণা রহিয়াই গেল, লেখক নীরদ চৌধুরী তাহা মিটাইতে দিলেন না। তাই বিদেশে বসিয়াই তিনি স্বদেশের স্মৃতি চারণা করিয়াছেন। বলিয়াছেন 'ইংলণ্ডের নদী দেখিয়াও দেশের নদীর কথা মনে হইয়াছে।[১৪৩]' আরও বলিয়াছেন 'সুদূর আর এক দেশে জলের ধারে বসিয়া দেশের মত দৃশ্য দেখিয়াছিলাম কোনো কোনো দিকে দৃশ্য অবশ্য সম্পূর্ণ অন্যরকমের, তবু বাংলার জল ও সেই জলের মধ্যে

একটা একাত্মতা ছিল।'[১৪৪] এই একাত্মতা বস্তুত ব্যক্তি নীরদ চৌধুরী ও বাংলার মধ্যে। লেখক নীরদ চৌধুরী তাঁহাদের মিলিতে দিলেন না। দেশে ফিরিলে পাছে তাঁহার জীবন-যাত্রার মান নামিয়া যায়, খ্যাতির পারা নামিয়া যায়—লেখক হিসাবে এ লজ্জাকে বরণ করিবার সাহস তাঁহার হইল না। তাই 'পেটে খিদে, মুখে লাজ' লইয়া ব্যক্তি নীরদ বিদেশের নদী দেখিয়া আপনার চক্ষের ক্ষুধা মিটাইলেন।

বঙ্কিমবাবুর 'বাবু' চরিত্রানুসরণে আমি কহিয়াছি নীরদবাবুর 'হস্ত দুর্বল হইলেও লেখনী ধারণে সুপটু'। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর ন্যায় ইহা আমি ব্যঙ্গ করিয়া কহি নাই। যথার্থ অর্থেই কহিয়াছি। বস্তুত, সংসারে নীরদবাবুর সবল হস্তের কখনো তেমন পরিচয় মেলেনা। কিন্তু লেখনী ধারণে তাঁহার সুপটুত্বের কথা অনস্বীকার্য। অসাধারণ শক্তিশালী তাঁহার লেখনী। যে কথা কেহ সাহস করে নাই লিখিতে, তিনি তাহা লিখিয়াছেন। তাঁহার বিশ্লেষণী শক্তি ক্ষুরধার লেখনীর মুখে প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়াছে। তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য তাঁহার লেখনীকে অনন্য মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছে। আমি তাঁহার লেখক রূপের প্রতিভাকে সসম্মানে স্বীকৃতি জানাই। কিন্তু সেইসঙ্গে এই কথাও বিস্মৃত হইনা যে, তাঁহার লেখনী যত শক্তিশালী, হস্ত ততই দুর্ব্বল। ইহাতেও তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায়না। কারণ-যিনি লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তিনি লেখক নীরদ চৌধুরী; আর যিনি দুর্ব্বল অপটু হস্তে সংসার সামলাইয়াছেন, ভয়ে হাত গুটাইয়া রাখিয়াছেন, তিনি ব্যক্তি নীরদচন্দ্র। দুইজনা অন্য মানুষ। আসুন, দু-একটি উদাহরণ দিয়া ব্যাপারটি পরিষ্কার করি।

পুত্রদের শিক্ষার বিষয়ে নীরদচন্দ্রকে তেমন সক্রিয় ভূমিকায় দেখি না। পুত্র বাবলুর কলেজে ভর্তি লইয়া সমস্যা দেখা দিলে তাঁহার স্ত্রী সেই ঝক্কি একাই সামলাইয়াছেন। তিনি 'যা হয় কর'[১৪৫] কহিয়াই খালাস হইয়াছেন। নীরদবাবুর বিধবা ভ্রাতৃবধূকে তাঁহার গৃহিণী অমিয়াদেবী নিঃসহায় অবস্থায় বিদায় করিতে চাহিলেও নীরদবাবু হাত বাড়াইয়া বাধা দিতে সাহস করেন নাই। যাতায়াতের ব্যাপারেও স্ত্রী ও সন্তানের হাত ধরিয়া দায়িত্ব লইতে তিনি সাহস পান নাই, এড়াইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পত্নী পুত্রদের লইয়া দিল্লী আসিয়াছেন অপরের উপর নির্ভর করিয়া। বেড়াইবার প্রসঙ্গ উঠিলেই তিনি স্ত্রীকে কহিয়াছেন— 'আমি যাবোনা, তুমি কোথাও

যেতে চাও, বেশ একাই ঘুরে এসো'[১৪৬] এমনকি তাঁহার চাকুরির মাহিনা আদায়ের ব্যাপারেও তিনি হস্ত প্রসারিত করিতে সাহস না পাইয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়াছেন। এ প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

কিন্তু লেখনী ধরিবার সময় এই হস্তই হইয়া উঠিয়াছে বজ্রমুষ্ঠির অধিকারী। তাঁহার লেখনীর সুতীক্ষ্ণ আঘাত হইতে কেহ এবং কিছুই প্রায় রেহাই পায় নাই। নীরদচন্দ্র ঐতিহাসিকের নিষ্ঠায় চিরিয়া-চিরিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকের ন্যায় বাঙালী জাতির ভিতরকার দুর্বলতার ইতিহাস বাহির করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের দ্বৈত রূপ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত গবেষণা করিবার সময় তিনি খেয়াল করেন নাই যে, তাঁহার তরবারিরূপ লেখনী কখন তাঁহারই ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়া তাঁহার সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছে। গ্রন্থটির ভূমিকাতে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া গিয়া জানাই এই ক্ষেত্রেও তাঁহার 'পেট ক্ষিদে, মুখে লাজ' প্রকাশ করিবার ভূমিকাটি অব্যাহত রহিয়াছে। ব্যক্তি নীরদের দুর্বল হস্ত যাহা করিতে পারে নাই, তাহা করিবার ক্ষুধা তাঁহার ভিতরে ছিল। সেই ক্ষুধাই তাহার বিশ্বগ্রাসী রূপ লইয়া লেখক নীরদের লেখনীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরীর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা আমি অস্বীকার করি না, বরং ঐ জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু সেইসঙ্গে এই কথাও মানিয়া লইয়া বাধ্য হই যে, আপনার পাণ্ডিত্য সম্পর্কে নীরদচন্দ্র অতিমাত্রায় সচেতন। তাই তিনি আপনাকে 'অনন্তজ্ঞানী' বিবেচনা করেন। তিনি যদি আপনার জ্ঞান সম্বন্ধে আরেকটু কম সচেতন হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞান প্রেমে পরিণত হইতে পারিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের ন্যায় তাঁহার জীবনে তাহা তো ঘটিলই না, আবার মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের ন্যায় আক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বলিতেও শুনিলাম না যে, তিনি জ্ঞানসমুদ্রের বালুকণামাত্র আহরণ করিয়াছেন। উপরন্তু লেখক নীরদ স্পষ্টই বলিয়াছেন-'....আমি জ্ঞানমাত্র অবলম্বন করিয়া জ্ঞান-বীর হইতে পারিব এই অভিমান বেশ প্রবল ছিল— বলিব এই দিকে আমার একটু অহঙ্কারই ছিল।'[১৪৭] তাই ব্যক্তি নীরদের ভিতর জ্ঞানের ক্ষুধা থাকিলেও আপনাকে 'অনন্ত জ্ঞানী' বিবেচনা করায় লেখক নীরদচন্দ্র তাহা লজ্জায় স্বীকার করিলেন না।

পরিচ্ছদে তাঁহার যত্নের কথা আর নূতন করিয়া কহিব না। বরং

উমেদারিতে তাঁহার তৎপরতা বিষয়ে দু-চার কথা কহিব। পিসতুতো দাদার নিকট উমেদারিতে নীরদবাবুর চাকুরি হইয়াছিল। শ্রীমান অভীকের নিকট উমেদারির ফলে বাংলা পত্র-পত্রিকায় তাঁহার অবাধ বিচরণ। এ প্রসঙ্গে লেখক নীরদচন্দ্র কহিয়াছেন-'শ্রীমান অভীকের পক্ষপাতিত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা না থাকিলে এই দুইটি (দেশ, আনন্দবাজার) কাগজের মত কাগজে আমার লেখা প্রকাশিত হইবে এই দুরাশা আমি কখনও করিতে পারি নাই।'[১৪৮] আরও খোলসা করিয়া তিনি বলিয়াছেন-'দেশীয় কাগজে আমার লেখার গুণ যাহাই হউক না কেন, তাহার জন্য কোনও লেখা প্রকাশিত হয় নাই, হইয়াছে খাতিরে, সুপারিসে ও দলাদলিতে।'[১৪৯] যশ-তৃষ্ণায় উমেদারি ধরিলেন লেখক নীরদ। কিন্তু লজ্জায় এই ক্ষুধার কথা গোপন রাখিলেন।

গৃহিণীর প্রতি ব্যক্তি নীরদের অটল ভক্তিতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। গভীর কৃতজ্ঞতায় নীরদচন্দ্র বলিয়াছেন-'আমার বৈষয়িক উন্নতি, লেখক হিসাবে সাফল্য, প্রতিষ্ঠা ও যশ, সর্বোপরি আমার জীবনের প্রকৃত সার্থকতার কথা আমার অপেক্ষা আমার পত্নীই বেশি চিন্তা করিতেন।'[১৫০] গৃহিণীর প্রতি ব্যক্তি নীরদের আনুগত্য এতদূর ছিল যে, বিবাহকালে তিনি মনে করিয়াছিলেন-'পত্নীর আপত্তি হইলে ইউরোপীয় সঙ্গীত ছাড়িয়া দিব।'[১৫১] এমনকি পত্নীর পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতেও তাঁহার লজ্জা হয় নাই। স্ত্রীর শাসনে তাঁহার গৃহে রুদ্ধ হইয়া থাকিবারও ঘটনা ঘটিয়াছে। এ-সকল কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। যাহা হউক, এই সকল ঘটনা ও উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রৈণ নীরদ চৌধুরীর চরিত্রটি গোপন থাকে নাই। অবশ্য আপনার এই ব্যক্তিত্বহীন স্ত্রী-শাসিত চরিত্রের জন্য ব্যক্তি নীরদের ভিতরে পৌরুষের ক্ষুধা রহিয়াই গেছে। লজ্জায় তাহা স্বীকার করেন নাই। তাই আপনার পৌরুষ প্রমাণের জন্য লেখক নীরদ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। অত্যন্ত স্পর্ধার সহিত আপনাকে প্রকাশ করা ও অন্যকে আক্রমণ করাকেই লেখক নীরদচন্দ্র তাঁহার পৌরুষের একমাত্র লক্ষণ বলিয়া ঠাউড়াইয়াছেন। ইহাও 'পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ' করিবার ফল। সুফল, না কুফল বলিব?

আশা করি এতক্ষণে নীরদচন্দ্রের বৈশম্পায়ন কথিত 'বাবু' চরিত্রটি সম্পূর্ণ ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছি। কিন্তু নীরদচন্দ্রকে 'বাবু' প্রতিপন্ন

করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছি যে, ব্যক্তি নীরদ যখন 'বাবু' হইয়াছেন, লেখক নীরদ তখন মহামানব হইতে চাহিয়াছেন। আর লেখক নীরদ যখন 'বাবু' হইয়াছেন, ব্যক্তি নীরদ তখন নিতান্ত গেরস্ত বাঙালী। সর্বোপরি, ইহা ঘটিয়াছে 'পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ' করিবার জের হিসাবেই। ইহাই বুঝাইবার জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম।

লেখক নীরদচন্দ্রের অর্থক্ষুধার জন্যও ব্যক্তি নীরদচন্দ্র লজ্জিত হইয়াছেন। তাই আপনার অর্থলোলুপতার কথা গোপন করিতে গিয়া বলিয়াছেন-'টাকার প্রতি উদাসীনতা আমার অক্ষমতার একটা অলঙ্ঘনীয় দিক।'[১৫২] কিন্তু বিবাহের সময় নীরদবাবুর যৌতুক দেখিয়া পুলক, শ্বশুর মহাশয়ের উত্তরাধিকাররূপে স্ত্রীর অর্থপ্রাপ্তির হিসাব লওয়া ইত্যাদি তাঁহার অর্থলিপ্সার কথা পূর্বেই ব্যাখ্যান করিয়াছি। ইহা ছাড়াও বলি, বিদেশে যাইতে নীরদবাবুর দ্বিধা করিবার প্রধান কারণ ছিল অর্থকরী বিষয়ে। ভাল মাহিনার চাকুরি ছাড়িয়া অনিশ্চিতের পিছনে ছুটিতে তিনি ভয় পাইয়াছেন-'এখানে ভাল মাইনের চাকুরিতে আছি।....এই অবস্থায় নিশ্চয়তা ছেড়ে অনিশ্চয়ের পিছনে যাওয়া কি উচিত হবে?'[১৫৩] আবার বিদেশ হইতে নীরদবাবুর ফিরিয়া না আসিবার কারণও এই অর্থ। আপনার বিলাতবাসের কারণ দর্শাইতে গিয়া নীরদ চৌধুরী স্পষ্টই কহিয়াছেন- 'দেশে কেহই আমাকে এক, দশ বৎসরের জন্য ইংরেজ শাসনকর্তারা ছাড়া—উপযুক্ত পারিশ্রমিক অর্থাৎ বেতন দেয় নাই।'[১৫৪] তিনি আরও বলিয়াছেন-'এখন বিলাতে যে পেনশন পাইতেছি উহা এখানকার হিসাবে উচ্চ না হইলেও আমার সভ্য ভাবে থাকার কোন ব্যাঘাত হইতেছে না।'[১৫৫] বিশেষত, দেশে থাকিলে তাঁহার পক্ষে প্রচুর অর্থ দিয়া সেরা বিলাতি ওয়াইন কেনা সম্ভব হইত না বলিয়া নীরদবাবু জানাইয়াছেন- 'এই শ্রেণীর মদ্য দূরে থাকুক, গলাধঃকরণের মত মদ্যও দেশে থাকিলে পাইতাম না।'[১৫৬]

বোখারী সাহেব নীরদ চৌধুরীকে আড়াইশত টাকা মাহিনাতে চাকুরী দিতে চাহিলে নীরদ চন্দ্র পরিষ্কার জানাইয়াছেন যে, এত কম মাহিনায় চাকুরি করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এ বিষয়ে তাঁহার সহধর্মিণী কহিয়াছেন যে, নীরদবাবু বোখারী সাহেবকে পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, '......অন্তত

পক্ষে চারশ টাকা না পেলে তিনি বোখারী সাহেবের প্রস্তাবের কাজ নিতে পারবেন না।'[১৫৭] দপ্তরে মাহিনা বাকি থাকিলে সেই অর্থ আদায়ের জন্যও নীরদবাবু পত্র লিখিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার স্ত্রীকে পত্রবাহিকার কাজটি করিতে হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নীরদবাবুর উদাসীনতা অর্থের প্রতি নহে, কর্মের প্রতি। তাই তিনি অল্প বয়সে আলস্য হেতুই চাকুরি ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালেও অর্থের বিষয়ে তাঁহাকে তদ্রূপ তৎপর হইয়া উঠিতে দেখা যায় নাই। অর্থ-বিমুখতা তাঁহার চরিত্রে কদাচ ছিল না। থাকিলে অল্প বয়সে দেনার দায়ে ডুবিতেন না এবং চাকুরির জন্য উমেদারিও করিতেন না। প্রভেদ কেবল এই যে, প্রথম জীবনে যখন নীরদ চৌধুরীর লেখক-সত্তা অপেক্ষা ব্যক্তি-সত্তাই প্রবল ছিল, তখন তিনি অর্থ-বিমুখ না হইলেও অর্থ-লোলুপ ছিলেন না। পরবর্তীকালে লেখক নীরদের এই লোলুপতা দেখা দিল। কিন্তু আপনার ইমেজ ভাঙিয়া তাহা প্রকাশ করিতে তিনি লজ্জা পাইলেন। তাই নির্লজ্জ চশমখোর হইলে যত অর্থ উপার্জন করিতে পারিতেন, তত করিতে পারিলেন না। খেদ রহিয়া গেল। লেখক নীরদ আক্ষেপ করিয়া ইন্‌টালেকচুয়্যালদের প্রসঙ্গ টানিয়া বলিলেন-'ইহাদের মধ্যে বোধহয় যৌবন হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত আমিই সর্বাপেক্ষা দরিদ্র।'[১৫৮] ইহাও তাঁহাকে বড়াইয়ের সুরে বলিতে হইল, 'পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ' থাকিলে ইহা ছাড়া আর কি-ই বা করিবার আছে? বার্নার্ড শ কহিয়াছিলেন-'সুযোগ আর সাহসের অভাবের নামই চরিত্র।' এক্ষেত্রেও তাহাই দেখি। যতদিন না সুযোগ পাইয়াছিলেন, ব্যক্তি নীরদের অর্থলোভ তেমন দেখা দেয় নাই, কিন্তু সুযোগ পাইতেই লেখক নীরদ অর্থের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে দ্বিধা করিলেন না। অথচ লজ্জার মাথা খাইয়া অর্থসর্বস্ব হইয়া উঠিতেও তাঁহার বাধিল। ইহার কারণ ব্যক্তি নীরদের সাহসের অভাব ও লেখক নীরদের চক্ষুলজ্জা। নীরদ চৌধুরীর চরিত্র ব্যাখ্যা করিবার আশা করি আর অধিক প্রয়োজন নাই। কেবল একখানি উদাহরণ দিই। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক আজীবন চাকুরিতে সৎ জীবন-যাপন করিয়াছেন বলিয়া গর্বচ্ছলে আক্ষেপ করিতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার মনের গোপনে অসৎ হইবার শখ থাকিলেও সাহস ছিল না। নীরদচন্দ্রের ন্যায় তাঁহারও দুইটি সত্তা ছিল। একটি খারাপ হইতে ভয় করিত অন্যটি খারাপ হইতে চাহিলেও লজ্জা পাইত এবং নির্লজ্জ অসৎ লোকেদের ঈর্ষা করিত।

আপনার চরিত্রবল ও সংযম লইয়া নীরদচন্দ্র চৌধুরী কিছু অধিক পরিমাণে বড়াই করিয়াছেন। বিশেষত, নারীর প্রতি তাঁহার উদাসীনতা ও সংযমের বিষয়ে স্বয়ং বলিয়াছেন-'এই কৃচ্ছ্রসাধনের ফল খারাপ হয় নাই। যখন যুবা বয়সে কলিকাতায় পড়ি, তখন.....পাশের বাড়ির গৃহিণী আসিয়া মাকে বলিলেন, 'দিদি, তোমার ছেলেরা কি ভালো! একদিনও জানলায় দেখতে পাইনে!' তিনি ঝি-বউ লইয়া ঘর করিতেন, সুতরাং প্রাণের ভয় ছিল।"[১৫৯] কিন্তু নীরদবাবুকে আমরা নারীর প্রতি আকর্ষণবশতই জানালায় না হউক, বারান্দায় দাঁড়াইতে দেখি। তিনি বলিয়াছেন, 'আমি আমাদের তিনতলায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া রাস্তায় কি হইতেছে দেখিবার সময় সেই বাড়ির সম্মুখের দিকে দোতলার একটা ঘরে দুইটি তরুণীকে পড়িতে দেখিতাম।'[১৬০] ইহা কেবল চক্ষে পড়িয়া যাওয়ার দরুণ দেখা নহে। শীঘ্রই জ্যোষ্ঠা তরুণীটির প্রতি নীরদবাবু আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁহার স্বীকারোক্তি-'কোনদিকে অভদ্রতা বা অশালীনতা প্রকাশ না করিয়া আমি অপলক চক্ষে তাহাকে দেখিতাম।'[১৬১] একটি অপরিচিতা যুবতীকে ড্যাবড্যাব করিয়া চাহিয়া দেখাই কি যথেষ্ট অভদ্রতা নহে? অবশ্য চক্ষুলজ্জার বশবর্তী হইয়া তিনি যুবতীটির সহিত আলাপ করিতে পারিলেন না। সযতনে ব্যক্তি নীরদের যৌবনের ক্ষুধা লেখক নীরদচন্দ্র গোপন করিলেন। তাহার ফলেই ঐ 'দৃষ্টিক্ষুধা'র জন্ম। এই 'দৃষ্টিক্ষুধা'র জন্য কাশীতে গিয়াও নীরদচন্দ্র শান্তি পান নাই। সামনের বাড়ির বারান্দায় একটি যুবতীকে দেখিয়া মজিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন 'মেয়েটির সুঠাম দেহ ও মুখের শ্রী আমার খুব ভাল লাগিত।"[১৬২] এইক্ষেত্রেও যথারীতি 'পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ' রহিল। সুতরাং এই ভাল লাগাও অকথিতই রহিয়া গেল। ফলে ফিরতি ট্রেনে উঠিয়া যৌবনের ক্ষুধা এত প্রবল হইল যে, তিনি লিখিয়াছেন-'আমি বেঞ্চের উপর শুইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম।"[১৬৩] লেখক নীরদের লজ্জাতিশয্য ব্যক্তি নীরদকে ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদাইল। ইহা যেন সুকুমার রায় কথিত সেই 'খুড়োর কল।' সম্মুখে লোভনীয় খাদ্য ঝোলে, কিন্তু তাহা নাগালের বাহিরে, মুখ হইতে লালা ঝরাই সার হয়। অবশ্য এই কলটির দৌলতে 'পাঁচ' ঘন্টায় রাস্তা 'দেড়' ঘন্টাতেই যাওয়া যায়। নীরদবাবুও জীবনের পাঁচ বৎসরের পথ মাত্র দেড় বৎসরেই অতিক্রম করিয়াছেন। অর্থাৎ কৈশোর হইতে যৌবনে উপনীত হইতে তাঁহার বেশি সময় লাগে নাই। অল্প বয়সেই ডেঁপো

হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে লাভ কি হইয়াছে? বরং শেষদিকে ব্যক্তি নীরদচন্দ্র উন্মাদবৎ হইয়া উঠিয়াছেন। আমার বক্তব্য সপ্রমাণ করিতে নীরদ চৌধুরীর উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি-'একদিন বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, সেই 'লনে'র উপর লালপেড়ে শাড়ি পরিয়া একটি তন্বী আমার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দৈহিক গঠনের শোভা দেখিয়া আমার মন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।.....কিন্তু একটু লক্ষ্য করিবার পরই দেখিলাম; এটি মোটেই জীবন্ত নারী নয়, একটি শাড়ি শুকাইবার জন্য দড়িতে ঝুলানো ছিল, উহাই বাতাসে ফুলিয়া তন্বীর মূর্তি হইয়াছিল।'[১৬৪] লেখক নীরদ চৌধুরী উক্ত ঘটনার যাহাই মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়া থাকুন, আমি বলিব তিনি ব্যক্তি নীরদচন্দ্রের উপর অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন। তাঁহার মানবিক ও প্রাকৃতিক চাহিদাকে 'খুড়োর কলে' নাচাইয়া তিনি বিবেচনার কাজ করেন নাই। তৃষ্ণায় উন্মাদ মানুষ মরীচিকা দেখিবেই। 'পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ' করিবার ইহাই ফল বটে। তবে এ ক্ষেত্রে বলিব, নারিকেল ফল। লেখক নীরদের বাহিরের খোলা নারিকেলের ন্যায় শক্ত হইলেও ভিতরে ব্যক্তি নীরদের রসালো শাঁস লুকাইয়া আছে। নীরদবাবু আপনার লেখক সত্তাকে ভাঙিয়া ভিতরের এই সরসতাকে কখনো প্রকাশ করিলেন না; বরং নারিকেলের ছোবড়া দিয়া সমালোচনার উত্তম রজ্জু প্রস্তুত করিয়া তাবড় তাবড় ব্যক্তিদের গলায় এমনকি বাঙালী জাতির গলাতেও বাঁধিলেন। সত্য বলিতে কি, ব্যক্তি নীরদের গলাতেও বাঁধিলেন, আমি প্রশ্ন করি গলায় দড়ি দিয়া উদ্বন্ধনে আপনাকে হত্যা করিবার দায়ে লেখক নীরদচন্দ্রকে পাঠকবর্গ কি শাস্তি দিতে চান? আমার ধারণা, আমি সাহস করিয়া নীরদচন্দ্ররূপী যে নারিকেলটি আজ সর্ব সমক্ষে ফাটাইলাম, পাঠকগণ তাহার মিষ্ট জল ও শাঁস খাইয়াই সন্তুষ্ট হইবেন।

আপনার কামকে সহজ উপায়ে চরিতার্থ করিতে না পারিয়া ব্যক্তি নীরদচন্দ্র কামকলার উপরে যাবতীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইয়াছেন। দুধ অপেক্ষা ঘোল সহজপাচ্য। তাই হজমও করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার ভাষাতেই বলি-'আমি চল্লিশ বৎসর পূর্বে আরেতিনো হইতে আরম্ভ করিয়া ক্যাসানোভা, ফ্যানি হিল অবধি পড়িয়া হজম করিয়া ফেলিয়াছি।'[১৬৫] লেখক নীরদ চৌধুরী স্পষ্টই বলিয়াছেন-''লেডী চ্যাটারলীজ লাভার' অতি ছোটলোকের ব্যাপার।'[১৬৬] এরূপ ছোটলোকের

কামের সহিত তিনি 'ধেনো মদে'র [১৬৭] তুলনা দিয়াছেন। কিন্তু লেখক নীরদ চৌধুরী বিলাতি শ্যাম্পেন পান করিলেও ছোটলোকদের কামগন্ধী ঐ সব গ্রন্থ হইতে 'ধেনো মদ' পান করিবার লোভ ব্যক্তি নীরদ সামলাইতে পারেন নাই। লেখক নীরদ যাহাকে ঘৃণা করিয়াছেন, ব্যক্তি নীরদ তাহাতেই আসক্ত হইয়াছেন। তাই লেখক নীরদ চৌধুরী ব্যক্তি নীরদ চৌধুরীর উপর বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। কোন মতে আপনার ব্যক্তিসত্তাকে বশে আনিতে না পারিয়া তিনি চাবুক হাঁকড়াইয়াছেন। কিন্তু লেখক নীরদ উত্তম অশ্বচালক নহেন। উত্তম অশ্বচালক কেবলমাত্র লাগাম টানিয়াই অশ্বকে ইচ্ছামতো চালনা করেন। আনাড়ী চাবুক মারিয়া সারা হন। লেখক নীরদ চৌধুরী তাহাই করিলেন। ফলে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া অশ্ব ছুটিল। নীরদচন্দ্র কেবল কামসমৃদ্ধ গ্রন্থ পড়িয়া ক্ষান্ত হইলেন না; অশ্লীল চিত্রপূর্ণ গ্রন্থও দেখিলেন। 'বাঙালী জীবনে রমণী' গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন 'গদ্যসাহিত্যে নর-নারীর সম্পর্ক লইয়া দুই রকমের রচনা আছে—প্রথম অশ্লীল রসিকতাপূর্ণ গল্প, দ্বিতীয়, বাংলা কামসূত্র। দুই-ই রিরংসার কাল্পনিক খোরাক যোগাইয়া পয়সা করিবার উদ্দেশ্যে লেখা। এইরূপ একখানি চিত্র সম্বলিত বইও আমি দেখিয়াছি।"[১৬৮] কেবল ছবিতেই নহে, বাস্তবে কোনও কাম চরিতার্থ করিবার দৃশ্য দেখা গেলে নীরদ চৌধুরী তাহা দেখিতে ছাড়িলেন না। আবার দেখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, কুশ্রী ভাষায় উহা লিখিয়া তৃপ্তি পাইলেন—'কেম্ব্রিজ নদীর ধারে বেড়াইবার সময়ে একদিন দেখিলাম, ভিড়ের ধারে ঘাসের উপর বসিয়া একটি প্রৌঢ় একটি প্রৌঢ়াকে আদর করিয়া কান কামড়াইতেছে।"[১৬৯] বাছিয়া বাছিয়া এই দৃশ্য কি ব্যক্তি নীরদচন্দ্রের চক্ষেই পড়ে?

বৃদ্ধ বয়সেও নীরদবাবুর কাম কিছু কমে নাই। উহা অন্যভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে মাত্র। লেখক নীরদচন্দ্রের অহঙ্কার ও রুচিবোধ তাঁহাকে নারী অঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দেয় নাই, কিন্তু নারীর সহিত আদিরসের রসিকতায় যে সুখ মিলে, তাহার লোভ ব্যক্তি নীরদ ছাড়িতে পারেন নাই। এতদ্বিষয়ে তাঁহার একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। লেখক নীরদ বলিয়াছেন—''অক্স্ফোর্ডে আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য যুবতীরা আসিলেও ভগীর মেয়ে পঞ্চীর মতো বলেন না—'ওমা, এ বুড়ো মিন্সেতো কম নয় গা। একি আমাকে খেয়ে ফেলতে চায় নাকি? ওমা, ছিঃ! ছিঃ!

ওকি গো, এযে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে? মর।' কিন্তু হয়ত পুঁটির মতো মনে মনে বলেন—'কত্তা আজ বাদে কাল শিঙে ফুঁকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না। ওমা! ছাইতে কি আগুন এতকালও থাকে, গা?''[১৭০] বোধকরি এই জাতীয় বৃদ্ধদের দেখিয়াই বাঙালী রমণীরা বলিয়াছিলেন—'পুরুষ মানুষ চিতেয় না উঠলে বিশ্বেস নেই।''

রমণীর আসঙ্গলিপ্সা বুড়া বয়সেও নীরদবাবুকে এত ব্যাকুলিত করিয়াছে যে, কামতাড়িত উন্মাদের ন্যায় তিনি বলিয়া বসিয়াছেন '.......এই বয়সেও আমি একটু খরচ করিলেই প্রতি রাত্রিতে একটি তরুণী পাইতে পারিতাম।''[১৭১] অবশ্য লেখক নীরদ চৌধুরী গর্ব করিয়া ইহাই জানাইতে চাহিয়াছেন যে, কাম চরিতার্থ করিবার এত সহজ উপায় থাকিতেও তিনি প্রলোভিত হন নাই। তথাপি উক্তিটির অন্তর্নিহিত যে আক্ষেপ, উহা রসিক পাঠকের কর্ণ এড়ায় না। আক্ষেপটি অবশ্যই ব্যক্তি নীরদের। বাস্তবিক, লেখকের ভাবমূর্তিটি সম্মুখে খাড়া না থাকিলে, লেখকের রুচি ও অহংবোধ তাঁহার পথ রুদ্ধ না করিলে, ব্যক্তি নীরদ হয়তো এই বৃদ্ধ বয়সেও নিম্নগামী মার্গে নামিতে ইতস্তত করিতেন না। তাই বিদেশে মনোরঞ্জনের এত পথ থাকিতে, বাছিয়া বাছিয়া এই পথটির কথা তাঁহার মনে হইল কেন? প্রসঙ্গত আমার স্কুলের একটি বান্ধবীর উল্লেখ করিব। বান্ধবীটি তাহার অভিভাবকের কড়া শাসনে থাকিত। আমরা স্কুলের টিফিনে আলুকাবলি, ফুচকা খাইলে সে লুব্ধ চক্ষে চাহিত এবং কপট বিরক্তির সুরে রুহিত—'পয়সা দিয়ে কিসব যে হাবিজাবি খাস্ তোরা। এই দ্যাখ্না আমাকে মা একটা টাকা দিয়েছে। ইচ্ছে করলেই আমি ফুচকা খেতে পারি, কিন্তু খাবনা। ডাব কিনে খাব। ওতে শরীর ভাল থাকে।' পরবর্তীকালে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর তাহাকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্মুখে ফুচকা খাইতে দেখিয়াছি। বলিয়াছি—'চিনতে পারছিস?' চিনিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। প্রশ্ন করিয়াছি—'বড় যে ফুচকা খাচ্ছিস?' বান্ধবীটি হাসিয়া ফেলিয়াছে। কহিয়াছে—'দূর! তখন তো বাবা-মার ভয়ে খেতুম না। এখন বিয়ে হয়ে গেছে। আমার বরও খুব ফুচকা ভালবাসে।' ব্যক্তি নীরদের দুর্ভাগ্য তিনি লেখক নীরদের অভিভাবকত্বের হাত হইতে রেহাই পাইলেন না। নতুবা তাঁহার অধঃপতন এতদূর হইয়াছিল যে, মাতৃসমা শাশুড়ি সম্পর্কেও তিনি কামজর্জর অশ্লীল

উক্তি করিয়াছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক সহপাঠী তাহার শাশুড়ি এবং স্ত্রী উভয়ের সহিত দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল। সেই প্রসঙ্গে নীরদ চৌধুরী বলিয়াছেন—'আমার নিজের বিবাহের সময় আমার বয়স ও আমার স্ত্রীর বয়সের মধ্যে বারো বৎসরের পার্থক্য ছিল, এবং আমার আর আমার শাশুড়ীর মধ্যে পার্থক্য ছিল তেরো বছরের। সুতরাং বিভূতিবাবুর সমপাঠীর মতো চরিত্র আমার হইলে সহজেই উভচর হইতে পারিতাম।"[১৭২] মাতৃস্থানীয়া মহিলা সম্পর্কে এবম্বিধ উক্তির অশোভনতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তাঁহার কল্পনাতেও এইরূপ বিকৃত কাম সম্পর্কের কথা আসিল কি করিয়া তাহা ভাবিতেও লজ্জাবোধ হয়। অবশ্য লেখক নীরদ তাঁহার এই বিকৃত কামনার কথা ঢাকিতে জাঁক করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার বিভূতিবাবুর সমপাঠীর ন্যায় চরিত্র নহে, নহিলে তিনি সহজেই 'উভচর' হইতে পারিতেন। কিন্তু এই কথাটিও অশ্লীল। বিশেষত, ইহাতে শাশুড়ির চরিত্রের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই। যাহার প্রকৃতি যেরূপ সে সেরূপে জগতকে দেখে। তাই নীরদবাবু মনে করিলেন যে, তিনি দুশ্চরিত্র হইলে 'সহজেই উভচর' হইতেন। —অর্থাৎ, তাঁহার শাশুড়ি তাঁহার এই অপপ্রচেষ্টায় বাধা দিতেন না, সহযোগিতাই করিতেন। ইহাতে যদি নীরদবাবু কহেন 'না'। আমার শাশুড়ী সচ্চরিত্রা, সদ্বংশীয়া রমণী।' সেক্ষেত্রে কহিব, তাহলে কি নীরদবাবু তাঁহার শাশুড়িকে ধর্ষণ করিবার কথা ভাবিয়াছিলেন?

'মাগী',[১৭৩] 'বেশ্যা"[১৭৪] 'পোঁদ"[১৭৫] 'মাই"[১৭৬] 'লপেটি"[১৭৭] 'ছেমো"[১৭৮] 'পেট করা"[১৭৯] 'ছেনালী"[১৮০] ইত্যাদি অশ্লীল শব্দ নীরদচন্দ্র প্রায়শই ব্যবহার করিয়াছেন। লেখক নীরদ অবশ্য বলিবেন যে, সত্য প্রকাশ করিবার জন্য ও ভাব পরিস্ফুট করিবার জন্য শব্দগুলির ব্যবহার প্রয়োজন হইয়াছে। আমি কিন্তু বলিব ইহা তাঁহার বিকৃতভাবে কাম মিটাইবার চেষ্টামাত্র। নতুবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় সত্য এবং ভাবের কিছু অভাব ঘটে নাই, কিন্তু অশ্লীল শব্দের অভাব অবশ্যই আছে। পক্ষান্তরে বলিব, নীরদবাবুর লেখায় পাণ্ডিত্য এবং আদিরসের কিছু অভাব ঘটে নাই, কিন্তু রুচির কিঞ্চিৎ অভাব ঘটিয়াছে। ইতিহাসের মলাটের ভিতর তিনি কামগন্ধী চিত্র আঁকিয়া আপনার যৌনাকাঙ্ক্ষা মিটাইয়াছেন। আর এই সত্যটি চাপা দিবার জন্যই 'বাঙালী জীবনে রমণী' নামক গ্রন্থের ভূমিকাতে আগেভাগেই কহিয়া রাখিয়াছেন—'বইটা পুরুষ ও নারীর দৈহিক সম্পর্কের আলোচনা নয়।'[১৮১]

লেখক নীরদ চৌধুরী বড় মুখ করিয়া বলিয়াছেন—''ছাত্রজীবনে বা প্রথম কর্মজীবনে কেহ কখনও আমার সহিত স্ত্রীঘটিত ব্যাপার লইয়া কথা বলিত না—তুলিলেও আমি হয়ত চালাইতে দিতাম না। কিন্তু আমার ধরণ-ধারণ দেখিয়া অন্যরা আমার কাছে এইসব প্রসঙ্গের উত্থাপনই করিত না। এখনও আমার অনেক বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি বলেন—নিন্দার ভাবেই বলেন যে, আমি 'সেক্স লইয়া কথা বলিনা।''[182] লেখক নীরদচন্দ্রের এই মিথ্যা ভড়ং টিকে নাই। এই গ্রন্থেরই ২৬ পৃষ্ঠায় তিনি স্বীকার করিয়াছেন—'অমি দিল্লীতে একদিন জনা ত্রিশেক বাঙালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সামনে কাম ও প্রেম সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলাম।''[183] স্ত্রীলোকের সম্মুখে কাম বিষয়ক আলোচনা করিয়া কামতৃপ্ত করিয়াছেন নীরদ চৌধুরী, অবশ্য লেখক নীরদচন্দ্র এই ঘটনাকে ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। অশোভন কাম আলোচনায় 'স্পষ্ট' কথা বলাকে তিনি গৌরবের বিষয় বলিয়া জানাইয়াছেন এবং 'শোভন' আখ্যা দিয়াছেন। অথচ অন্যত্র তিনিই কহিয়াছেন—'নর-নারীর দৈহিক আকর্ষণ সম্বন্ধে খোলাখুলি কথা আমাদের নীতিজ্ঞানকে ক্ষুণ্ণ করে না বটে, কিন্তু আমাদের শ্লীলতাবোধে আঘাত দেয়।''[184]

নীরদ চৌধুরী যেমন কাম বিষয়ে বলিয়াছেন, তেমনি শুনিয়াওছেন। কাম বিষয়ে তাঁহার অতি উৎসাহের ফলে এমনটি ঘটিয়াছে। কিন্তু লেখক নীরদ তাহা অস্বীকার করিয়া কৈফিয়ৎ খাড়া করিয়াছেন 'শ্রবণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর হওয়াতে বহু চাপা কথাবার্তা কানে আসিয়া পৌঁছিত, অশ্লীল ধরণ-ধারণও চোখে পড়িত।''[185] আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রখর শ্রবণ শক্তি বা দৃষ্টিশক্তির বলে তিনি কখনও ভাল কিছু দেখিতে বা শুনিতে পান নাই। কোথায় কোন যুবতীর কে পেট করিয়াছে। কে শাশুড়ির সহিত সঙ্গম করে এই সবই তাঁহার শুনিবার বিষয়। ইহার কারণ দেখিয়াছেন এবং শুনিয়াছেন ব্যক্তি নীরদ, লেখক নীরদ তো লিখিয়াই খালাস। কিন্তু লিখিবার সময়েও ব্যক্তি নীরদের কামের ছাপ পড়িল তাঁহার লেখায়। লেখক নীরদ আপনার ছায়াকে তাড়া করিয়া ফিরিতে লাগিলেন।

বালক বয়সেই নীরদ চৌধুরী বেশ ডেঁপো হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই বালিকাদের ব্রত কথার সময় মোক্তার মহাশয়ের মুহুরীর যৌনাঙ্গ হইতে রক্ত পড়িতে দেখিয়া তাঁহার বুঝিতে অসুবিধা হয় নাই যে, 'শহরের

উপকণ্ঠে বেশ্যাপাড়া বলিয়া যে একটা বেড়া দেওয়া দোচালা-চারচালা বসতি আছে সেখানে যাওয়ার জন্যই এই ধরণের রোগ হয়।"[১৮৬] প্রসঙ্গত, বলিয়া রাখি, নীরদ চৌধুরীর বয়স তখন মাত্র আট। আমার আট বৎসরের পুত্র আছে। সে দূরদর্শনে জন্মনিরোধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন এবং নারীদের মাসিক রজঃস্রাব সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন দেখিয়া কিছুই বুঝে না। 'মা, এটা কিসের বিজ্ঞাপন?' বলিয়া অস্থির করিয়া তোলে। এ সম্বন্ধে যদি তাহার আবছা ধারণাও থাকিত, সেক্ষেত্রে সে আমাকে প্রশ্ন করিতনা; চুপ করিয়া থাকিত। বালক নীরদ তাই ঐ দৃশ্য দেখিয়া চুপ করিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন—'উহা লইয়া চেঁচামেচি বা মাতামাতি একেবারে অহেতুক।"[১৮৭] ছেলেবেলায় এই দৃশ্য দেখিবার ফলেই হউক বা বেশ্যাপাড়া সম্বন্ধে অতি শৈশবে অবহিত হইবার জন্যই হউক, বেশ্যাদের প্রতি ব্যক্তি নীরদচন্দ্রের বিশেষ মনোযোগ দেখা যায়। লেখক নীরদচন্দ্রের লেখা হইতে তাহা আবিষ্কার করিতে অসুবিধা হয় না। 'বাঙালী জীবনে রমণী'র ভূমিকা নিরূপণ করিতে গিয়া তিনি এই প্রসঙ্গ বারবার টানিয়া আনিয়াছেন। প্রয়োজনে টানিয়া আনুন ক্ষতি নাই, কুৎসিত ভাষায় তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। বেশ্যার 'মাই-এ হাত দিতে দশ টাকা"[১৮৮] লাগে—এ তথ্য কি বন্ধু মারফৎ তাঁহার না দিলেই চলিত না? শোভন ভাষাতেওতো তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব। নীরদবাবু তো কেবল ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিতেন যে, তাঁহার বন্ধুকে তাহার কাকা বারাঙ্গনা জগতের সকল সংবাদ দিতেন। কিন্তু লেখক নীরদচন্দ্র সেখানে থামিতে চাহিলেও ব্যক্তি নীরদচন্দ্র তাঁহাকে থামিতে দিলেন না। বেশ্যা সংক্রান্ত আপনার অনভিজ্ঞতাজাত ক্ষোভ তৎবিষয়ক ইতর ভাষায় লিখিয়া পূরণ করিলেন।

আপনাকে ব্রাহ্মমতপন্থী বলিয়া জানাইয়া নীরদচন্দ্র নাক সিঁটকাইয়া বলিয়াছেন—'........আমি সারা জীবনেও দেশে কোনও থিয়েটার দেখি নাই। আমার বাল্যকালে অভিনেত্রীরা বেশ্যা বলিয়া থিয়েটারের প্রতি ব্রাহ্মপন্থীদের ঘোরতর আপত্তি ছিল।"[১৮৯] আর দেখিতে পারেন নাই বলিয়াই পিপাসা রহিয়া গেছে। এছাড়া বারাঙ্গনাদের আকর্ষণীয় রূপের পাশে আপনার ছোটখাটো চেহারার কথা স্মরণ করিয়া ব্যক্তি নীরদচন্দ্র হীনমন্যতায় ভুগিয়াছেন। বলিয়াছেন—"নূতন দিল্লীর পথের বেশিরভাগই বারাঙ্গনাদের বাস। তাহাদের দালাল রাত্রি ছাড়াও দিনের বেলাতেও আসিয়া আমাকে

ক্ষুদ্রকায় দেখিয়া উত্তরাপথের বারবণিতার অযোগ্য ভাবিত ও বলিত 'বোম্বাই কী ছোটিসি খুবসুরৎ ছুকরী।'''[১৯০] চেহারার দিক হইতে বারবণিতার অযোগ্য হওয়াতে দুষ্প্রাপ্যের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া অনুমান করি। নতুবা দিল্লীতে এত লোক থাকিতে বেশ্যার দালাল আসিয়া দিন নাই রাত নাই বাছিয়া বাছিয়া নীরদবাবুকেই ধরিবে কেন? তিনি উহা জানিয়াও প্রত্যহ ঐ পথে ভ্রমণ করিতেন কেন? কলিকাতাতেও নীরদবাবু সেই পথেই প্রত্যহ ভ্রমণ করিতেন, যে পথে বেশ্যার ল্যান্ডোগাড়ি আসিয়া রাজা বাহাদুরের ফটকে ঢুকিত। তৎবিষয়ে তাঁহার কৌতূহল এতই প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি ব্যাপারটি অনুসন্ধানের জন্য বন্ধুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং ঐ ঘটনার আলোকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, 'পত্নী তাঁহার পিতার দান, উপপত্নী স্বেচ্ছাবৃত্ত প্রণয়িনী।'[১৯১] তাই লাভ ম্যারেজের নিমিত্ত নীরদ চৌধুরী নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে উক্ত বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়াতে পিতার দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিহাসছলে উক্ত প্রসঙ্গটি নীরদবাবু উত্থাপন করিলেও তাহার অন্তর্নিহিত ক্ষোভ গোপন থাকে নাই—''আমিও 'লাভ ম্যারেজে'র জন্য কত মানসিক শঙ্খচিলকে প্রণাম করিলাম, তবু সেই বিবাহ ঘটিল না। অবশেষে ১৯৩১ সনের নভেম্বর মাসে পিতার চরণে পড়িয়া আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে অনুরোধ করিলাম।''[১৯২] যাহা পাইলেন না, তাহার প্রতি আকর্ষণ আরও বাড়িল, উপপত্নীর প্রণয়ের নিমিত্ত চিত্ত ব্যাকুল হইল।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে লেখক নীরদচন্দ্র কহিয়াছেন-'আমার মতে এইসব উপায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অপব্যবহার....উহাকে পাপ ভিন্ন আর কিছুই বলা চলে না।.....হিন্দুর শাস্ত্রে আছে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'....বিবাহিত জীবন পর্যন্ত ছদ্মবেশে বেশ্যাবৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'[১৯৩] বিবাহিত নর-নারীর পবিত্র মিলনের মধ্যেও নীরদ চৌধুরী বেশ্যার প্রসঙ্গ টানিয়া আনিলেন। এমনকি স্ত্রীর গহনা চাহিবার আব্দারের ভিতরেও তিনি বেশ্যাবৃত্তির আভাস দেখিয়াছেন 'অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী গরজ বুঝিয়া দাম্পত্যজীবনে থাকিয়া গহনা-কাপড়-পয়সা আদায়কারিণীর গণিকার বৃত্তি চালাইত, এবং স্বামীও ধর্মভ্রষ্ট হইয়া এবং নিজে ব্যাধি না আনিয়া থাকিলে ব্যাধিগ্রস্থ হইবার ভয় না রাখিয়া বারবণিতা ভোগ করিতেছে মনে করিয়া খুশী হইত।'[১৯৪] কিন্তু এ খুশী ব্যক্তি নীরদচন্দ্রের ভাগ্যে জুটিল না। তাঁহার

কিম্বা অমিয়াদেবীর কাহারও গ্রন্থে গহনা বা কাপড়ের প্রতি তাঁহার স্ত্রীর আসক্তির প্রকাশ দেখি না। সুতরাং কল্পনায় বারবণিতা ভোগ করিবার সৌভাগ্যও নীরদচন্দ্রের হইল না। তাহাতে ক্ষোভ এবং হিংসা কিছু অধিক হইল। ফলে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বাস্তব প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করিয়া স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে 'ছদ্মবেশে বেশ্যাবৃত্তি' বলিয়া গালি দিলেন। আপনার বিবাহিত জীবনের সংযমকে অত্যন্ত উঁচুদরের মনে করিয়া নাক উঁচু করিলেন। নাক উঁচু না করিলে দেখিতে পাইতেন লেখক নীরদ চৌধুরীর গালি বুমেরাং হইয়া ফিরিয়া আসিয়া কালি ছিটাইয়াছে ব্যক্তি নীরদচন্দ্রের গায়ে। কেন না, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'-ইহাই যদি বেদবাক্য হয়, তাহা হইলে একটি পুত্র সন্তান লাভ করা মাত্রই সন্তানোৎপাদনের প্রচেষ্টা হইতে নীরদবাবুর বিরত হওয়া উচিত ছিল। 'দ্রৌপদী' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—'' একাধিক পুত্রের উৎপাদন ধর্মার্থে নিষ্প্রয়োজনীয়—কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ফলমাত্র।''[১৯৫] সুতরাং দেখা যাইতেছে বকধার্মিক লেখক নীরদ চৌধুরীর 'ছদ্মবেশে বেশ্যাবৃত্তি'র ছদ্মবেশটুকুও টিকিল না।'

'বাঙালী জীবনে রমণী' গ্রন্থে নীরদবাবু বারাঙ্গনাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা কিছুর কথাই বলিতে বাকি রাখিলেন না। বেশ্যাবৃত্তির পক্ষ লইয়া তিনি বলিলেন 'নিজের ব্যবসা চালাইয়া পেট গুজরান বা টাকা করিবার অধিকার বেশ্যার আছে। একথা আমি মানি। সুতরাং আমি আমাদের ছুঁৎমার্গী কংগ্রেসী নীতিবাদীদের উদ্দেশ্যে বলি—

বেশ্যাবাড়ী ধ্বংস করে
করেছ একি কংগ্রেসী?
বিশ্বময়ে দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!''[১৯৬]

*আমিও এইরূপে নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে বলিতে ইচ্ছা করি—*

বেশ্যাবাড়ী নাহি গিয়ে
করেছ একি চৌধুরী?
গ্রন্থময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!

# উপসংহার

সুধী পাঠকবৃন্দ,

আমার গ্রন্থটি পাঠ করিয়া আশা করি আপনারা আত্মঘাতী নীরদ চৌধুরীর দ্বিখণ্ডিত রূপটি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু ইহার ভিতরে যে ট্রাজেডি নিহিত আছে, তাহার গভীরতা পরিমাপ করিতে পারিয়াছেন কি? আসুন, রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পের আলোকে এই ট্রাজেডির ভিতরকার রূপটি দেখিয়া লই।

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে চাকর রাইচরণ আপনার পুত্রকে কখনও আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। বিশ্বাস করিয়াছে উহা তাহার মনিবেরই পুত্র। তাহার ঘরে ছল করিয়া আসিয়া জন্মাইয়াছে। তাই রাইচরণ তাহাকে বাবুদের পুত্রের ন্যায় সাধ্যাতীতভাবে লালন-পালন করিয়াছে এবং শেষকালে বাবুর হস্তে তাহাকে অর্পণ করিয়াছে। নীরদবাবুর প্রসঙ্গে আমি বলিব, এইরূপে ব্যক্তি নীরদও কখনও লেখক নীরদকে আপনার বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই। লেখক নীরদের জীবনকে তিনি 'দেবোত্তর সম্পত্তি' মনে করিয়া সম্ভ্রমের সঙ্গে রক্ষা করিয়াছেন। এই 'দেবোত্তর সম্পত্তি' কি? নীরদ চৌধুরীর ভাষায়—'সেই সম্পত্তির দেবতা হইবে দেশ। ইহার পর অন্য আদর্শ এবং লক্ষ্য দেখা গিয়েছে ; কিন্তু কৃত্য যাহা হউক, জীবন যে সেই কৃত্য সাধনের জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি এই ধারণা আমার মন হইতে কখনই লোপ পায় নাই। আমি সর্বদাই মনে করিয়াছি এই জীবনের উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই।'[১৯৭] যিনি একথা মনে করিয়াছেন, তিনি ব্যক্তি নীরদ চৌধুরী ; আর তাঁহার এই অনধিকৃত ও উৎসর্গীকৃত জীবন হইল লেখক নীরদচন্দ্রের। তাই মনগড়া আদর্শের হস্তে লেখক নীরদচন্দ্রকে সমর্পণ করিয়া ব্যক্তি নীরদ ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছেন। এমত সময়ে ভৃত্য রাইচরণের পুত্র যেমন

রাইচরণকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও উদারভাবে করুণা করিয়া তাহার নকল পিতাকে রাইচরণের পক্ষ লইয়া বলিয়াছিল—'বাবা, উহাকে মাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।'"[১১৮] তেমনি লেখক নীরদও ব্যক্তি নীরদকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও উদারতা দেখাইয়া করুণাবশে দেশ ও দশের আদর্শের নিকট আবেদন করিলেন—'ওকে মাপ করে দাও। আমার লেখক রূপের যশোরাজ্য থাকতে না দাও, বরং লিখে যে অর্থ রোজগার করব তা ওকে বরাদ্দি করে দাও।' রাইচরণ তাহার পুত্রের দান গ্রহণ করে নাই, কিন্তু ব্যক্তি নীরদ লেখক নীরদের এই অশ্রদ্ধার দান হাত পাতিয়া গ্রহণ করিলেন।। ইহা হইতে বড় ট্রাজেডি আর কী হইতে পারে।

# উৎসপঞ্জী

১. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ১৭
২. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ৯৫
৩. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ' ২ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ মাঘ ১৪০২, পৃঃ ১
৪. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ৯৬
৫. ঐ পৃঃ ৯২
৬. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ' প্রঃ প্রঃ মাঘ ১৩৯৮, পৃঃ ৫
৭. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪ পৃঃ ১০০
৮. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ' প্রঃ প্রঃ মাঘ ১৩৯৮, পৃঃ ৬
৯. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ১৬
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'সমাপ্তি' রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ খণ্ড প্রঃ প্রঃ শ্রাবণ ১৩৯৬, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৩৯৭
১১. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ৪৬
১২. ঐ, পৃঃ ১৬
১৩. পরশুরাম ঃ 'কজ্জলী' প্রঃ প্রঃ ১৩৩৫, পৃঃ ৬৯
১৪. ঐ, পৃঃ ৬৯
১৫. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ১৬৭
১৬. ঐ, পৃঃ ২০৫
১৭. ঐ, পৃঃ ২০১
১৮. ঐ, পৃঃ ১৭
১৯. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আত্মঘাতী বাঙালী' ১ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৫, পৃঃ ১০
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'লোকহিত', রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২ খণ্ড প্রঃ প্রঃ শ্রাবণ, ১৩৯৬, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৫৪৮

২১. ঐ, পৃঃ ৫৪৮
২২. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ৫৩
২৩. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ঃ 'টুনটুনি আর রাজার কথা' 'উপেন্দ্র কিশোর সমগ্র রচনাবলী' ১ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ জন্মাষ্টমী ১৩৮০, পৃঃ ১৩১
২৪. ঐ, পৃঃ ১৩১
২৫. ঐ, পৃঃ ১৩১
২৬. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ১০৭
২৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিম রচনাবলী, ১ খণ্ড প্রঃ প্রঃ আশ্বিন, ১৩৬০, পৃঃ ৪৩৭
২৮. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আত্মঘাতী বাঙালী' ১ খণ্ড, ভূমিকা, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫, পৃঃ ৯
২৯. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ৭৭
৩০. ঐ, পৃঃ ৯১
৩১. ঐ, পৃঃ ৯৩
৩২. অমিয়া চৌধুরাণী ঃ 'দিদিমার যুগ ও জীবন' প্রঃ প্রঃ মাঘ ১৩৯৮, পৃঃ ১৩৫
৩৩. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ৯৪
৩৪. বিবেকানন্দ ঃ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' ১লা বৈশাখ, ১৩৯১, বিবেকানন্দ রচনাবলী, প্রঃ প্রঃ পৃঃ ৬৮৭
৩৫. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ৪৬
৩৬. ঐ, পৃঃ ৯৫
৩৭. ঐ, পৃঃ ১৮৯
৩৮. ঐ, পৃঃ ১৮৯
৩৯. ঐ, পৃঃ ১৯৩
৪০. ঐ, পৃঃ ১৮২
৪১. ঐ, পৃঃ ৯৬
৪২. ঐ, পৃঃ ৯৯
৪৩. ঐ, পৃঃ ১০৩
৪৪. স্বামী প্রেমঘনানন্দ ঃ 'রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প' ত্রয়োদশ সংস্করণ

মার্চ, ১৯৬০, পৃঃ ৫৫

৪৫. ঐ, পৃঃ ৫৫

৪৬. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ১১৫

৪৭. ঐ, পৃঃ ১১৭

৪৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ 'ইংরেজ স্তোত্র' বঙ্কিম রচনাবলী, ২ খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৯

৪৯. অমিয়া চৌধুরাণী ঃ 'দিদিমার যুগ ও জীবন' প্রঃ প্রঃ ১৩৯৮, পৃঃ ১২৮

৫০. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ২৩৯

৫১. ঐ, পৃঃ ২৩৯

৫২. ঐ, পৃঃ ২৪৩

৫৩. বিবেকানন্দ ঃ 'ভারতের নারী' বিবেকানন্দ রচনাবলী, প্রঃ প্রঃ ১লা বৈশাখ, ১৩৯১, পৃঃ ৬৮৭

৫৪. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ৪০

৫৫. ঐ, পৃঃ ৪১

৫৬. ঐ, পৃঃ ৪১

৫৭. ঐ, পৃঃ ২২

৫৮. ঐ, পৃঃ ৪৫

৫৯. ঐ, পৃঃ ৪৫

৬০. ঐ, পৃঃ ৪৭

৬১. ঐ, পৃঃ ৩৯

৬২. ঐ, পৃঃ ১১১

৬৩. ঐ, পৃঃ ১৭২

৬৪. অমিয়া চৌধুরাণী ঃ 'প্রবাসিনী দিদিমা' প্রঃ প্রঃ, ১৯৯৪, পৃঃ ১৭৩

৬৫. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ১৭১

৬৬. ঐ, পৃঃ ২৩৩

৬৭. ঐ, পৃঃ ২৬০

৬৮. ঐ, পৃঃ ২০৪

৬৯. অমিয়া চৌধুরাণী ঃ 'দিদিমার যুগ ও জীবন' প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩৯৮, পৃঃ ১৭৬

৭০. ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী ঃ 'মনের বিকার ও প্রতিকার' প্রঃ প্রঃ ১৩৯৯, পৃঃ ১০৬

৭১. নীরদ চৌধুরী : 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ১৬৮
৭২. ঐ, পৃঃ ৭৭
৭৩. ঐ, পৃঃ ৭৭
৭৪. নীরদ চৌধুরী : 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ' ২ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৪০২, পৃঃ ২
৭৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'লোকরহস্য' বঙ্কিম-রচনাবলী ২ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৬১, পৃঃ ৯
৭৬. অমিয়া চৌধুরাণী : 'প্রবাসিনী দিদিমা' প্রঃ প্রঃ ১৯৯৪, পৃঃ ৫১
৭৭. নীরদ চৌধুরী : 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ৭৮
৭৮. ঐ, পৃঃ ১৮৭
৭৯. ঐ, পৃঃ ১৮৭
৮০. ঐ, পৃঃ ২৫১
৮১. নীরদ চৌধুরী : 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ' ২খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯৮, পৃঃ ৫
৮২. নীরদ চৌধুরী : 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ১২৭
৮৩. অমিয়া চৌধুরাণী : 'প্রবাসিনী দিদিমা' প্রঃ প্রঃ ১৯৯৪, পৃঃ ৩৩
৮৪. নীরদ চৌধুরী : 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ৯৫
৮৫. ঐ, পৃঃ ১০০
৮৬. বিবেকানন্দ : 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' বিবেকানন্দ-রচনাবলী, প্রঃ প্রঃ ১লা বৈশাখ, ১৩৯১, পৃঃ ৮২
৮৭. ঐ, পৃঃ ৮৪
৮৮. পরশুরাম : 'কচি-সংসদ' : 'কজ্জলী' প্রঃ প্রঃ ১৩৩৫, পৃঃ ১৭৪
৮৯. নীরদ চৌধুরী : 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ১১৬
৯০. ঐ, পৃঃ ৪১
৯১. ঐ, পৃঃ ৪১
৯২. ঐ, পৃঃ ১৯৪
৯৩. ঐ, পৃঃ ১৭০
৯৪. সুনীলকুমার সরকার : 'ফ্রয়েড' প্রঃ প্রঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০, পৃঃ ১০৮
৯৫. নীরদ চৌধুরী : 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ' ২ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯৮, পৃঃ ৬৭
৯৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র রচনাবলী' ১০ম খণ্ড 'রাশিয়ার চিঠি' প্রঃ প্রঃ ১৩৯৬, পৃঃ ৫৫৭
৯৭. ঐ, পৃঃ ৫৫৮

৯৮. অমিয়া চৌধুরাণী ঃ 'প্রবাসিনী দিদিমা' প্রঃ প্রঃ ১৯৯৪, পৃঃ ৭

৯৯. ঐ, পৃঃ ১৯৫

১০০. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ৫৩

১০১. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আত্মঘাতী বাঙালী' ১খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯৫, পৃঃ ১৪৮

১০২. অমিয়া চৌধুরী ঃ 'দিদিমার যুগ ও জীবন' প্রঃ প্রঃ ১৩৯৮, পৃঃ ১৭৪

১০৩. ডঃ সুনীলকুমার সরকার ঃ 'ফ্রয়েড' প্রঃ প্রঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০, পৃঃ ৫৭

১০৪. নীরদ চৌধুরী ঃ 'বাঙালী জীবনে রমণী' প্রঃ প্রঃ চৈত্র, ১৩৭৪, পৃঃ ১৯১

১০৫. ঐ, পৃঃ ১৯১

১০৬. ঐ, পৃঃ ৫০

১০৭. ঐ, পৃঃ ৫১

১০৮. ঐ, ভূমিকা পৃঃ ১৫

১০৯. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ৬৩

১১০. ঐ, পৃঃ ৬৩

১১১. ঐ, পৃঃ ২৫১

১১২. ঐ, পৃঃ ২৩৯

১১৩. ঐ, পৃঃ ২৩৯

১১৪. ঐ, পৃঃ ২৩৯

১১৫. ঐ, পৃঃ ২৭৩

১১৬. ঐ, পৃঃ ২৭৪

১১৭. ঐ, পৃঃ ২৮১

১১৮. ঐ, পৃঃ ১৭০

১১৯. 'পরশুরাম গ্রন্থবলী'ঃ তৃতীয় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৭৬, পৃঃ ২৩৪

১২০. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ৪৭

১২১. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'বাঙালী জীবনে রমণী' প্রঃ প্রঃ চৈত্র, ১৩৭৪, পৃঃ ২১

১২২. ঐ, পৃঃ ২২

১২৩. অমিয়া চৌধুরাণী ঃ 'প্রবাসিনী দিদিমা' প্রঃ প্রঃ এপ্রিল, ১৯৯৪, পৃঃ৮১

১২৪. অমিয়া চৌধুরাণী ঃ 'দিদিমার যুগ ও জীবন' প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩৯৮, পৃঃ ১৫৪

১২৫. নীরদ চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ২০২

১২৬. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'বাঙালী জীবনে রমণী' প্রঃ প্রঃ চৈত্র ১৩৭৪, নিবেদন;

পৃঃ ১০
১২৭. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ৭৭
১২৮. ঐ, পৃঃ ৭৮
১২৯. ঐ, পৃঃ ৮১
১৩০. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'আত্মঘাতী বাঙালী' ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫, পৃঃ ১৪৮
১৩১. ঐ, পৃঃ ১৩৯
১৩২. ঐ, পৃঃ ১৩৯
১৩৩. বঙ্কিম-রচনাবলী ২য় খণ্ড ঃ (সাহিত্য সংসদ). প্রঃ ১৩৬১, পৃঃ ৭
১৩৪. 'বিবেকনন্দ রচনা সমগ্র'ঃ প্রঃ প্রঃ ১লা বৈশাখ ১৩৯১, পৃঃ ৮৬
১৩৫. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ১৭৩
১৩৬. ঐ, পৃঃ ১৬৯
১৩৭. বঙ্কিম-রচনাবলী ২য় খণ্ড, (সাহিত্য সংসদ) প্রঃ প্রঃ ১৩৬১, পৃঃ ৯-১০
১৩৮. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'আত্মঘাতী বাঙালী'১ম খণ্ড প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫, পৃঃ ৪২
১৩৯. 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', বিশ্বভারতী, দ্বাদশ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭, পৃঃ ৬৬২
১৪০. ঐ, পৃঃ ৬৬২
১৪১. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ৮৫
১৪২. ঐ, পৃঃ ২৬৭
১৪৩. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'বাঙালী জীবনে রমণী' প্রঃ প্রঃ চৈত্র, ১৩৭৪, পৃঃ ৮২
১৪৪. ঐ, পৃঃ ৮২
১৪৫. অমিয়া চৌধুরাণী ঃ 'প্রবাসিনী দিদিমা' প্রঃ প্রঃ এপ্রিল, ১৯৯৪, পৃঃ ১৭৫
১৪৬. ঐ, পৃঃ ১৬৪
১৪৭. শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ১৯০
১৪৮. ঐ, পৃঃ ৩৪
১৪৯. ঐ, পৃঃ ৩৩
১৫০. ঐ, পৃঃ ৮৫
১৫১. ঐ, পৃঃ ২৩৮
১৫২. ঐ, পৃঃ ১৮২

১৫৩. ঐ, পৃঃ ৮৫
১৫৪. ঐ, পৃঃ ৯৫
১৫৫. ঐ, পৃঃ ৯৫
১৫৬. ঐ, পৃঃ ১০২
১৫৭. অমিয়া চৌধুরাণী ঃ 'দিদিমার যুগ ও জীবন' প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩৯৮, পৃঃ ২৩৩
১৫৮. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ১০৩
১৫৯. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'বাঙালী জীবনে রমণী' প্রঃ প্রঃ চৈত্র ১৩৭৪, পৃঃ ৬০
১৬০. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ২১১
১৬১. ঐ, পৃঃ ২১২
১৬২. ঐ, পৃঃ ১৯৯
১৬৩. ঐ, পৃঃ ২০০
১৬৪. ঐ, পৃঃ ২৩১
১৬৫. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'বাঙালী জীবনে রমণী' প্রঃ প্রঃ চৈত্র, ১৩৭৪, পৃঃ ২৭
১৬৬. ঐ, পৃঃ ২৭
১৬৭. ঐ, পৃঃ ২৭
১৬৮. ঐ, পৃঃ ৫৪
১৬৯. ঐ, পৃঃ ২৫
১৭০. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ৯২
১৭১. ঐ, পৃঃ ৯৯
১৭২. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'আত্মঘাতী বাঙালী' ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫, পৃঃ ১২২
১৭৩. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'বাঙালী জীবনে রমণী' প্রঃ প্রঃ চৈত্র, ১৩৭৪, পৃঃ ৪৩
১৭৪. ঐ, পৃঃ ৪৯
১৭৫. ঐ, পৃঃ ৫১
১৭৬. ঐ, পৃঃ ৭৭
১৭৭. ঐ, পৃঃ ৫৪
১৭৮. ঐ, পৃঃ ৭২
১৭৯. ঐ, পৃঃ ৭৬
১৮০. ঐ, পৃঃ ৭২
১৮১. ঐ, ভূমিকা পৃঃ ১৫

১৮২. ঐ, পৃঃ ৪৮

১৮৩. ঐ, পৃঃ ২৬

১৮৪. ঐ, পৃঃ ২০০

১৮৫. ঐ, পৃঃ ৫৬

১৮৬. ঐ, পৃঃ ৪৯

১৮৭. ঐ, পৃঃ ৪৯

১৮৮. ঐ, পৃঃ ৭৭

১৮৯. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'আত্মঘাতী বাঙালী' ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫, পৃঃ ১৩৪

১৯০. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৯৯৪, পৃঃ ১০৬

১৯১. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'আত্মঘাতী বাঙালী' ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫, পৃঃ ১২৬

১৯২. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই ১৯৯৪, পৃঃ ২৩৩

১৯৩. ঐ, পৃঃ ২৮৫

১৯৪. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'বাঙালী জীবনে রমণী' প্রঃ প্রঃ চৈত্র, ১৩৭৪, পৃঃ ৬৩

১৯৫. 'বঙ্কিম রচনাবলী' ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রঃ প্রঃ দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পৃঃ ১৭৫

১৯৬. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'বাঙালী জীবনে রমণী' প্রঃ প্রঃ চৈত্র ১৩৭৪, পৃঃ ১৯১

১৯৭. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রঃ প্রঃ জুলাই ১৯৯৪, পৃঃ ২৭২

১৯৮. রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিশ্ব-ভারতী, অষ্টম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ফাল্গুন, ১৩৯৫, পৃঃ ৫১৮